হিমালয়ের ভয়ংকর

হেমেন্দ্রকুমার রায়

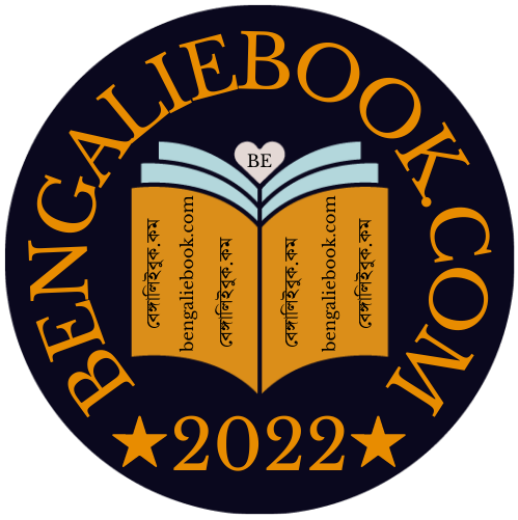

হিমালয়ের ভয়ংকর

এক । কার পা

কুমার সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ ঝড়ের মতন ঘরের ভিতর ঢুকে বলে উঠল, কুমার, কুমার। শিগগির, শিগগির করো! ওঠো, জামাকাপড় ছেড়ে পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে নাও!

কুমার হতভম্বের মতন চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপরে রেখে বললে, ব্যাপার কী বিমল?

বেশি কথা বলবার সময় নেই! বিনয়বাবু তার মেয়ে মৃণুকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছেন, জানো তো? হঠাৎ আজ সকালে তাঁর এক জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তার মেয়েকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর এর ভেতরে নাকি গভীর রহস্য আছে। অবিলম্বে আমাদের সাহায্যের দরকার।...একথা শুনে কি নিশ্চিন্তে থাকা যায়? দার্জিলিংয়ের ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টা দেরি। আমি প্রস্তুত, আমার মোটঘাট নিয়ে রামহরিও প্রস্তুত হয়ে তোমার বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে, এখন তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। ওঠো, ওঠো, আর দেরি নয়!

কুমার একলাফে চেয়ার ত্যাগ করে বললে, আমাদের সঙ্গে বাঘাও যাবে তো?

তা আর বলতে! হয়তো তার সাহায্যেরও দরকার হবে!

জিনিসপত্তর গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে কুমারের আধঘণ্টাও লাগল না! সবাই শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে ছুটল!

দার্জিলিং! দূরে হিমালয়ের বিপুল দেহ বিরাট এক তুষার দানবের মতন আকাশে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে আছে। কিন্তু তখন এসব লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা কারুরই ছিল না।

একটা গোল টেবিলের ধারে বসে আছে বিমল ও কুমার। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রামহরি, এবং ঘরের ভিতরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন বিনয়বাবু।

যাঁরা যকের ধন প্রভৃতি উপন্যাস পড়েছেন, বিমল, কুমার ও রামহরিকে তারা নিশ্চয়ই চেনেন। আর যাঁরা মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন ও মায়াকানন প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সরলপ্রাণ বিপুলবক্ষ ও শক্তিমান এই বিনয়বাবুর নতুন পরিচয় বোধহয় আর দিতে হবে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, তারপর বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন, মৃণু বেড়াতে গিয়েছিল বৈকালে। সন্ধে থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে না পেয়ে মনে মনে ভাবলুম, হয়তো এতক্ষণ সে বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাসায় ফিরে দেখি, মৃণু তখনও আসেনি। লোকজন নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম, সারারাত ধরে তাকে পথে-বিপথে সর্বত্র কোথাও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, তারপর সকালবেলায় আধমরার মতন আবার শূন্য বাসায় ফিরে এলুম। বিমল! কুমার! তোমরা জানো তো, মৃণু আমার একমাত্র সন্তান। তার বয়স হল প্রায় ষোলো বৎসর, কিন্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বলে এখনও তার বিয়ে দিইনি। তার মা বেঁচে নেই, আমিই তার সব। তাকে ছেড়ে আমিও একদণ্ড থাকতে পারি না। আমার এই আদরের মৃণুকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, এখন আমি কেমন করে বেঁচে থাকব?বলতে বলতে বিনয়বাবুর দুই চোখ কান্নার জলে ভরে উঠল।

কুমার বললে, বিনয়বাবু, স্থির হোন। মৃণুকে যে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি এরকম সন্দেহ করছেন কেন?

বিনয়বাবু বললেন, সন্দেহের কারণ আছে কুমার! মৃণু হারিয়ে যাবার পর দুদিনে এখানকার আরও তিনজন লোক হারিয়ে গেছে।

বিমল বললে, তারাও কি স্ত্রীলোক?

না, পুরুষ। একজন হচ্ছে সাহেব, বাকি দুজন পাহাড়ি। তাদের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যজনক। অনেক খোঁজ করেও পুলিশ কোনও সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি।

বিমল ও কুমার একসঙ্গে বলে উঠল, কী আবিষ্কার করেছেন বিনয়বাবু?

শহরের বাইরে পাহাড়ের এক জঙ্গল ভরা গুঁড়ি-পথের সামনে মৃণুর একপাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েছি। সেখানে তন্নতন্ন করে খুঁজেও জুতোর অন্য পাটি আর পাইনি। এথেকে কি বুঝব? জুতোর অন্য পাটি মৃণুর পায়েই আছে। ইচ্ছে করে একপাটি জুতো খুলে আর এক পায়ে জুতো পরে কেউ এই পাহাড়ে-পথে হাঁটে না। মৃণুকে কেউ বা কারা নিশ্চয়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে-হিঁচড়ে বা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে, আর সেই সময়েই ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে তার পা থেকে এক-পাটি জুতো খুলে পড়ে গিয়েছে।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, যে-জায়গায় আপনি মৃণুর জুতো কুড়িয়ে পেয়েছেন, সে জায়গাটা আমাদের একবার দেখাতে পারেন?

কেন পারব না? কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনওই লাভ নেই। বিশজন লোক নিয়ে সেখানকার প্রতি ইঞ্চি জায়গা আমি খুঁজে দেখেছি, আমার পর পুলিশও খুঁজতে বাকি রাখেনি। তবু-

বিমল বাধা দিয়ে বললে, তবু আমরা আর একবার সে জায়গাটা দেখব। চলুন বিনয়বাবু, এস কুমার!

বিমলের আগ্রহ দেখে বিনয়বাবু কিছুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবু মুখে কিছু না বলে সকলকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বাঘাও বাসায় একলাটি শিকলিতে বাঁধা থাকতে রাজি হল না, কাজেই কুমার তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

ঘণ্টা-দুয়েক পথ চলার পর সকলে যেখানে এসে হাজির হল, পাহাড়ের সে-জায়গাটা ভয়ানক নির্জন। একটা শুড়ি-পথ জঙ্গলের বুক ফুড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে, তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, এখানেই মৃণুর একপাটি জুতো পাওয়া যায়।

বিমল অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করলে, কিন্তু নতুন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না।

কুমার বললে, যদি কেউ মৃণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে ওই শুড়ি-পথের ভেতর দিয়েই হয়তো সে গেছে।

বিনয়বাবু বললেন, ও-পথের সমস্তই আমরা বার বার খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি।

এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতরে খানিক তফাত থেকে বাঘার ঘন ঘন চিৎকার শোনা গেল।

কুমার তার বাঘার ভাষা বুঝত। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, বাঘা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু। দেখেছে! বাঘা! বাঘা!

তার ডাক শুনে বাঘা একটু পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে উত্তেজিত ভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল। তারপর কুমারের মুখের পানে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে একবার ডাকে, আবার জঙ্গলের ভিতরে ছুটে যায়, আবার বেরিয়ে আসে, ল্যাজ নেড়ে ডাকে, আর জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢোকে।

কুমার বললে, বিনয়বাবু, বুঝতে পারছেন কি, বাঘা আমাদের জঙ্গলের ভেতরে যেতে বলছে?

বিমল বললে, বাঘাকে আমিও জানি, ওকে কুকুর বলে অবহেলা করলে আমরাই হয়তো ঠকব! চলো, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যাক।

জঙ্গলের ঝোপঝাপ ঠেলে সকলেই বাঘার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হল। যেতে যেতে বিমল লক্ষ করলে, জঙ্গলের অনেক ঝোপঝাঁপ যেন কারা দু-হাতে উপড়ে ফেলেছে, যেন একদল মত্তহস্তী এই জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে গিয়েছে। বিমল শুধু লক্ষই করলে, কারুকে কিছু বললে না।

বাঘাকে অনুসরণ করে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, একটা ঝোপের পাশে মানুষের এক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

সে দেহ এক ভুটিয়ার। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, মাথাটাও ভীষণভাবেও ফেটে গিয়েছে আর তার চারিপাশে রক্তের স্রোত জমাট হয়ে রয়েছে।

বিনয়বাবু স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী আশ্চর্য! জঙ্গলের এখানটাও তো আমরা খুঁজেছি, কিন্তু তখন তো এ দেহটা এখানে ছিল না!

কুমার বললে, হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে তারপরে! দেখছেন না, ওর দেহ থেকে এখনও রক্ত ঝরছে!

হঠাৎ দেহটা একটু নড়ে উঠল।

বিমল তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললে, এ যে এখনও বেঁচে আছে।

আহত ব্যক্তি ভুটিয়া ভাষায় যন্ত্রণা-ভরা খুব মৃদু স্বরে বললে, একটু জল।

বিমলের ফ্লাস্কে জল ছিল। ফ্লাস্কের ছিপি খুলতে খুলতে সে শুধোলে, কে তোমার এমন দশা করলে?

দারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠে সে খালি বললে, ভূত ভূত!..জল!

বিমল তার মুখে জল ঢেলে দিতে গেল, কিন্তু সে জল হতভাগ্যের গলা দিয়ে গলল না, তার আগেই তার মৃত্যু হল।

কুমার হঠাৎ ভীত ভাবে সবিস্ময়ে বলে উঠল, বিমল! দেখ, দেখ!

জমাট রক্তের উপরে একটা প্রকাণ্ড পায়ের দাগ! সে দাগ অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতো কিন্তু লম্বায় তা প্রায় আড়াই ফুট এবং চওড়াতেও এক ফুটেরও বেশি! মানুষের পায়ের দাগ এত বড় হওয়া কি সম্ভব? যার পা এমন, তার দেহ কেমনধারা?

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই বিষম পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কাঠের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

.

দুই। বাবা মহাদেবের চ্যালা

সকলের আগে কথা কইলেন বিনয়বাবু। ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, বিমল! কুমার! একি অসম্ভব ব্যাপার। আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?

রামহরি আড়ষ্টভাবে মত প্রকাশ করলে, এ মস্তবড় একটা বিদকুটে ভূতের পায়ের দাগ না হয়ে যায় না!

কুমার বললে, বিমল, আমরা কি আবার কোনও ঘটোৎকচের (আবার যকের ধন দ্রষ্টব্য) পাল্লায় পড়লুম, মানুষের পায়ের দাগ তো এতবড় হতেই পারে না!

.

পায়ের দাগটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বিমল বললে, মানুষের পায়ের দাগ এতবড় হওয়া সম্ভব নয় বটে কিন্তু এ দাগ যে অমানুষের পায়েরও নয়, এটা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

বিনয়বাবু বললেন, কি প্রমাণ দেখে তুমি একথা বলছ?

বিমল মৃত ভুটিয়ার একখানা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে নিয়ে বললে, এর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সকলে দেখলে, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছে।

বিনয়বাবু চুলগুলো লক্ষ করে দেখে বললেন, এ কার মাথার চুল? এত লম্বা, আর এত মোটা?

বিমল বললে, এ চুল যে ওই ভুটিয়ার মাথার চুল নয়, সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে কেমন করে চুলগুলো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে এল?

কুমার বললে, যার আক্রমণে ও-বেচারির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, এগুলো নিশ্চয়ই তার মাথার চুল!

বিমল বললে, আমারও সেই মত। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে ভুটিয়াটা নিশ্চয়ই তার চুল মুঠো করে ধরেছিল।...দেখুন বিনয়বাবু, চুলগুলো ঠিক মানুষেরই মাথার চুলের মতো, কিন্তু মানুষের মাথার চুল এত মোটা হয় না। এই পায়ের দাগ আর এই মাথার চুল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ভুটিয়াকে যে আক্রমণ করেছিল, লম্বায় সে হয়তো পনেরো-ষোলো ফুট উঁচু!

কুমার হতভম্বের মতো বললে, বায়োস্কোপের কিংকং কি শেষটা হিমালয়ে এসে দেখা দিল?

বিমল বললে, আরে কিংকং তো গাঁজাখুরি গল্পের একটা দানব গরিলা। আর আমরা এখানে সত্যিকারের যে পায়ের দাগ দেখছি, এটা তো গরিলার নয়-কোনও দানব বা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড মানুষের পায়ের দাগ!..এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন মানুষ কি থাকতে পারে?

কুমার বললে, হিমালয়ের ভিতরে যদি এমন কোনও অজানা জন্তু থাকে,যার পায়ের দাগ আর মাথা বা গায়ের চুল মানুষের মতো?

বিনয়বাবু বললেন, হয়তো ও মাথার চুল আর পায়ের দাগ জাল করে কেউ আমাদের ধাঁধায় ফেলবার বা ভয় দেখাবার ফিকিরে আছে।

বিমল বললে, আচ্ছা, এই চুলগুলো আপাতত আমি তো নিয়ে যাই, পরে কোনও অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই সব বোঝা যাবে।

রামহরি বারবার ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, এসব কোনও কথার মতো কথাই নয়, ওই ভুটিয়াটা মরবার সময়ে যা বলেছিল তাই হচ্ছে আসল কথা! এসব হচ্ছে ভূতের কাণ্ডকারানা!

বিনয়বাবু করুণ স্বরে বললে, আমার মৃণু কি আর বেঁচে আছে?

বিমল তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বললে, চুপ!

তখন পাহাড়ের বুকের ভিতরে সন্ধ্যা নেমে আসছে,-দূরের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেছে। পাখিরা যে যার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, চারিদিক স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে অজানা শব্দ হচ্ছেধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। কারা যেন খুব ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

বাঘা কান খাড়া করে সব শুনে রেগে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের এক থাবড়া খেয়ে একেবারে চুপ মেরে গেল!

বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে, শিগগির, লুকিয়ে পড়ুন–কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোথাও।

বিমলেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সবাই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আরও একটু এগিয়েই দেখা গেল, ছোট গুহার মতন একটা অন্ধকার গর্ত, হামাগুড়ি না দিলে তার মধ্যে ঢোকা যায় না এবং তার মধ্যে অন্য কোনও হিংস্র জানোয়ার থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে সব কথা কেউ মনেও আনলে না, কোনও রকমে গুঁড়ি মেরে একে একে সকলেই সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ভয় পায়নি কেবল বাঘা, তার ঘন ঘন ল্যাজ নাড়া দেখেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল, এ এক মস্ত মজার খেলা!

গর্তের মুখের দিকে মুখ রেখে বিমল হুমড়ি খেয়ে বসে রইল–সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

দেখতে-দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে বিমলের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিলে। কান পেতেও সেই ধুপধুপুনি শব্দ আর কেউ শুনতে পেলে না।

বুনো হাওয়া গাছে গাছে দোল খেয়ে গোলমাল করছিল, তাছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়া গর্তের ভিতরে ঢুকে সকলের গায়ে যেন বরফের ছুরি মারতে লাগল।

কুমার মৃদুস্বরে বললে, বোধ হয় আর কোনও বিপদের ভয় নেই,–এইবারে বাইরে বেরিয়ে পড়া যাক!

ঠিক যেন তার কথার প্রতিবাদ করেই খানিক তফাত থেকে কে অট্টহাসি হেসে উঠল। খুব বড় গ্রামোফোনের হর্নে মুখ রেখে অট্টহাসি করলে যেমন জোর আওয়াজ হয়, সে হাসির শব্দ যেন সেইরকম, কিন্তু তার চেয়েও শুনতে ঢের বেশি ভীষণ!

সে হাসি থামতে না থামতে আরও পাঁচ-ছয়টা বিরাট কণ্ঠে তেমনি ভয়ানক অট্টহাস্যের স্রোত ছুটে গেল! সে যেন মহা মহাদানবের হাসি, মানুষের কান এমন হাসি কোনওদিনই শোনেনি। যাদের হাসি এমন, তাদের চেহারা কেমন?

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে আগুনের আভা এবং মাঝে মাঝে তার শিখাও দেখা গেল।

বিমল চুপিচুপি বললে, আগুন জ্বেলে কারা ওখানে কী করছে?

রামহরি বললে, ভূতেরা আগুন পোয়াচ্ছে!

বিমল বললে, লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?

রামহরি টপ করে তার হাত ধরে বললে, থাক, অত শখে আর কাজ নেই।

মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক কণ্ঠের অদ্ভুত চিৎকার জেগে জেগে উঠে সেই পাহাড়ে-রাত্রির তন্দ্রা ভেঙে দিতে লাগল। সে রহস্যময় চিৎকারের মধ্যে এমন একটা হিংসার ভাব ছিল যে, শুনলেই বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। সে যে কাদের কণ্ঠস্বর তা জানবার বা বোঝবার যো ছিল না বটে, কিন্তু সে চিৎকার যে মানুষের নয়, এটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

বিমল বললে, আ-হা-হা-হা, থাকত আমার বন্দুকটা সঙ্গে, তাহলে ওদের চালাকি এখনি বার করে দিতুম।

কুমার বললে, আরে রাখো তোমার বন্দুকের কথা। কাল সারারাত কেটেছে ট্রেনে আমার এখন খিদে পেয়েছে, আমার এখন ঘুম পেয়েছে।

বিমল বললে, ও পেটের আর ঘুমের কথা কালকে ভেব, আজকের রাতটা দেখছি এখানেই কাটাতে হবে।

.

সদ্যজাগা সূর্য যখন হিমালয়ের শিখরে শিখরে সোনার মুকুট বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর বিমলদের মোটেই ছিল না।

মাঝরাতের পরেই জঙ্গলের আগুন নিবে ও সেই আশ্চর্য চিৎকার থেমে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই গর্ত থেকে বেরুবার জন্যে বিমল ও কুমার ছটফটিয়ে সারা হচ্ছিল, কিন্তু বিনয়বাবু ও রামহরির সজাগ পাহারায় এতক্ষণ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি।

এখন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তারা এক এক লাফে গর্তের বাইরে এসে পড়ল এবং আবার স্বাধীনতা পেয়ে তাদের চেয়েও কম খুশি হল না বাঘা, কারণ যেখানে আগুন জ্বলছে। ও চিৎকার হচ্ছে সেখানটায় একবার ঘুরে আসবার জন্যে তারও মন কাল সারারাত আনচান করেছে। তাই গর্ত থেকে বেরিয়েই বাঘা সেই জঙ্গলের ভিতরে ছুট দিলে এবং তার পিছনে পিছনে ছুটল বিমল ও কুমার।

কাল যেখান থেকে তারা পালিয়ে এসেছে, আজ তারা প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হাজির হল। দেখেই বোঝা গেল, কাঠ কাটরা এনে কারা সেখানে সত্য-সত্যই আগুন জ্বেলেছিল। ভস্মের স্তূপ থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

মাটির উপরেও ইতস্তত ছাই ছড়ানো রয়েছে। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিমল বললে, দেখো।

কুমার অবাক হয়ে দেখলে, সেখানকার ছাইগাদার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেমনি মানুষের মতন-অমানুষের পায়ের দাগ রয়েছে অনেকগুলো!

বাঘা সেই এক-একটা পায়ের দাগ শোকে, আর রেগে গরগর করে ওঠে! তারও বুঝতে দেরি লাগল না যে, এসব পায়ের দাগ রেখে গেছে যারা, তারা তাদের বন্ধু নয়!

.

ততক্ষণে বিনয়বাবুর সঙ্গে রামহরিও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। বিমলকে ডেকে সে গম্ভীর ভাবে বললে, খোকাবাবু, আমার কথা শোনো। হিমালয় হচ্ছে বাবা মহাদেবের ঠাঁই। বাবা মহাদেব হচ্ছেন ভূতেদের কর্তা। এ-জায়গাটা হচ্ছে ভূতপ্রেতদের আড্ডা। যা দেখবার, সবই তো দেখা হল–আর এখানে গোলমাল কোরো না, লক্ষ্মীছেলের মতো ভালয় ভালয় বাসায়। ফিরে চলো!

বিনয়বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী ব্যাপার! সেই ভুটিয়াটার লাশ কোথায় গেল?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুমার বললে, নিশ্চয় কোনও জন্তু-টন্তু টেনে নিয়ে গিয়েছে!

রামহরি বললে, ওই যে, তার জামা আর ইজের ওইখানে পড়ে রয়েছে।

বিমল একটা গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে ছাইগাদা নাড়তে নাড়তে বললে, কুমার, কোনও জন্তু-টন্তুতে সে লাশ টেনে নিয়ে যায়নি, সে লাশ কোথায় গেছে তা যদি জানতে চাও তবে। এই ছাইগাদার দিকে নজর দাও।

ও কী! ছাইয়ের ভেতরে অত হাড়ের টুকরো এল কোথা থেকে?

হ্যাঁ, আমারও কথা হচ্ছে তাই। কুমার, কাল রাতে যারা এখানে এসেছিল, তারা সেই ভুটিয়াটার দেহ আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে!

রামহরি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

.

তিন। রামহরির শাস্ত্র- বচন

সকলে স্তম্ভিতভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেবল বাঘা পায়ের দাগগুলো শুঁকতে শুঁকতে অজ্ঞাত শত্রুদের বিরুদ্ধে তখনও কুকুর-ভাষায় গালাগালি বৃষ্টি করছিল।

বিমল তার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটি ক্যামেরা বার করে বললে, এই আশ্চর্য পায়ের দাগের একটা মাপ আর ফটো নিয়ে রাখা ভালো। পরে দরকার হবে।

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করবার দরকার নেই। যা দেখছি তাই-ই যথেষ্ট। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃণুকে খুঁজে আর কোনওই লাভ নেই- নরখাদক রাক্ষসদের কবলে পড়ে সে-অভাগীর প্রাণ- বলতে বলতে তার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল, তিনি আর কথা কইতে পারলেন না।

কুমার বললে, বিনয়বাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের এত শীঘ্র বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মৃণু যে এই নরখাদকদের পাল্লায় পড়েছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই! আমার বিশ্বাস, আমরা তাকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারব।

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তোমার কথাই সত্য হোক।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, আমরা যখন ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে পড়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম পৃথিবীর আদিম জন্তুদের বিষয়ে আপনার অনেক পড়া শোনা আছে। আপনি বানর জাতীয় কোনও দানবের কথা বলতে পারেন-আসলে যারা বানরও নয়, মানুষও নয়!

বিনয়বাবু বললেন, বানরদের মধ্যে দানব বলা যায় গরিলাদের। কিন্তু তারা বড়-জাতের বানরই। পণ্ডিতরা বহুকাল ধরে বানর আর মানুষের মাঝামাঝি যে জীবকে অন্বেষণ করছেন, গরিলারা তা নয়। তবে সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় এক অদ্ভুত জীবের খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় টারা (Tarra) নামে এক নদী আছে। সেই নদীর ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দুটো মস্তবড় বানর-জাতীয় জীব হঠাৎ একদল মানুষকে আক্রমণ

করে। তাদের একটা মদ্দা, আর একটা মাদি। মানুষের দল আক্রান্ত হয়ে গুলি করে মাদিটাকে মেরে ফেলে, মদ্দাটা পালিয়ে যায়। মাদিটা পাঁচফুটের চেয়েও বেশি লম্বা। সুতরাং আন্দাজ করা যেতে পারে যে, মদ্দাটা হয়তো মাথায় ছয় ফুট উঁচু হবে। আমি মৃত জীবটার ফোটো দেখেছি। তাকে কতকটা বানর আর মানুষের মাঝামাঝি জীব বলা চলে। কিন্তু তুমি এসব কথা জানতে চাইছ কেন? তোমার কি সন্দেহ হয়েছে যে, ওই পায়ের দাগগুলো সেইরকম কোনও জীবের?

বিমল বললে, সন্দেহ তো অনেক রকমই হচ্ছে, কিন্তু কোনওই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এ পায়ের দাগ গরিলার মতো কোনও বানরেরও নয়, মানুষেরও নয়–এ হচ্ছে বানর আর মানুষের চেয়ে ঢের বেশি বড় কোনও জীবের। এরা নরমাংস খায়, কিন্তু বানর-জাতীয় কোনও জীবই নরমাংসের ভক্ত নয়। মানুষই বরং অসভ্য অবস্থায় নরমাংস ভক্ষণ করে। কাল আমরা যে অট্টহাসি শুনেছি, বানরের গলা থেকে তেমন অট্টহাস্য কেউ কোনওদিন শোনেনি। বানররা বা আর কোনও জানোয়াররাই হাসতে পারে না, হাসিও হচ্ছে মানুষেরই নিজস্ব জিনিস। মানুষের মতন পায়ের দাগ, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দৈর্ঘ তার বারো-চোদ্দো ফুট কি আরও বেশি, মানুষেরই মতন হাসতে পারে, এমন জীবের কথা কে শুনেছে, এমন জীবকে কে দেখেছে, তাও আমরা জানি না। কোথায় তাদের ঠিকানা, তাই বা কে বলে দেবে?

রামহরি বললে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে কৈলাসে। আদ্যিকালে তারাই দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে। দিয়েছিল, আর একালে তারাই এসেছে আমাদের মুণ্ডুপাত করতে।...তারা কেমন দেখতে, কী। করে, কি খায়, কোথায় থাকে, একথা তোমাদের জানবার দরকার কি বাপু?

রামহরির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিনয়বাবুর মাথার উপর দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ঠিকরে গিয়ে দুম করে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল! ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না বুঝতে আরও চার-পাঁচখানা তেমনি বড় বড় পাথর তাঁদের আশে-পাশে, মাঝখানে এসে পড়ল– এক একখানা পাথর ওজনে একমন-দেড়মনের কম হবে না।

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে,পালাও–পালাও! ছোটো।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! প্রত্যেকে ছুটতে লাগল–কালবোশেখির ঝড়ের বেগে! পাথর-বৃষ্টির তোড় দেখে বাঘারও সমস্ত বীরত্ব উপে গেল, তার বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন পলায়নই হচ্ছে প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র ভালো উপায়! ওরকম প্রকাণ্ড পাথর একখানা মাথায় পড়লে মানুষ তো ছার, হাতি-গন্ডারকেও কুপোকাত হতে হবে!

অনেকদূর এসে সবাই আবার দাঁড়াল। খানিকক্ষর ধরে হাঁপ ছাড়বার পর কুমার বললে, ওঃ, আজ আর একটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আর কি!

রামহরি বললে, এসব হচ্ছে আমার কথা না শোনার শাস্তি। জানো না, শাস্তরে আছে–ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা!

বিমল বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার শাস্ত্র নিয়ে তুমিই থাকো রামহরি, এসময়ে আর তোমার শাস্ত্র আউড়ে আমাদের মাথা গরম করে দিও না।

বিনয়বাবু বললেন, আর এখানে দাঁড়ানো না, একেবারে বাসায় গিয়ে ওঠা যাক চলল।

চলতে চলতে বিমল বললে, অমন বড় বড় পাথর যারা ছোট ছোট ঢিলের মতো ছুঁড়তে পারে, তাদের আকার আর জোরের কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

কুমার বললে, আর এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমরা ওখানে বসে যখন ওদের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলুম, তখন ওরাও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সকলকে লক্ষ করছিল।

বিনয়বাবু বললেন, তাদের শক্তির যে পরিচয়টা পাওয়া গেল তাতে তো মনে হয় ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের কড়ে আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা না করে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে এল কেন?

বিমল বললে, এও একটা ভাববার কথা বটে। হয়তো তারা আত্মপ্রকাশ করতে রাজি নয়। হয়তো দিনের আলো তারা পছন্দ করে না। হয়তো পাথর ছোঁড়াটা তাদের খেয়াল।

কুমার বললে, কিন্তু বিমল, এ-রহস্যের একটা কিনারা না করে আমরা ছাড়ব না। রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে।

রামহরি চোখ কপালে তুলে বললে, এই ভূতের আড্ডায়?

বিমল কুদ্ধস্বরে বললে, হা, হ্যাঁ, এই ভূতের আড্ডায়! জানো না, আমরা কেন এখানে এসেছি? জানো না, বিনয়বাবু কেন আমাদের সাহায্য চেয়েছেন?

রামহরি মুখ কাচুমাচু করে বললে, না, না খোকাবাবু, আমাকে মাপ করো, ভূতের ভয়ে সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

এমনি সব কথা কইতে কইতে সকলে রঙ্গিট রোড দিয়ে ভুটিয়া বস্তির কাছে এসে পড়ল। সেখানে এসে দেখলে, মহা গণ্ডগোল। চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে কাঁদছে, আর তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়ে, ভুটিয়া, লিম্বু ও ল্যাপচা জাতের অনেকগুলো পাহাড়ি লোক উত্তেজিত ভাবে গোলমাল করছে।

তাদেরই ভিতর থেকে একজন মাতব্বরগোছের বুড়ো ভুটিয়াকে বেছে নিয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, এখানে এত শোরগোলের কারণ কী?

বুড়ো ভুটিয়াটা বিশৃঙ্খল ভাবে যে-সব কথা বললে, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে এইরকম দাঁড়ায়

আজ কিছুকাল ধরে এখানে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়েছে। বৌদ্ধ গুম্ফায় অনেক পূজা মানত করেও উপদ্রব কমেনি।

প্রথম প্রথম উপদ্রব বিশেষ গুরুতর হয়নি। পাহাড়ে পাহাড়ে যখন রাতের আঁধার নেমে আসত, মানুষরা যখন বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিত, তখন আশেপাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে যেন কাদের চাঁচামেচি শোনা যেত!

তারপর নিশীথ-রাতে মাঝে মাঝে বস্তির লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। ঘুম ভাঙলেই তারা শুনতে পায় বস্তির ভিতর দিয়ে যেন দুমদুম করে পা ফেলে মত্ত মাতঙ্গের দল। আনাগোনা করছে। তাদের পায়ের দাপে পাহাড়ের বুক যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে। সে শব্দ শুনেই সকলের বুকের রক্ত জল হয়ে যায়, মায়ের কোলে ছেলেমেয়েরা ককিয়ে ওঠে। পাছে বাইরের তারা সে কান্না শুনতে পায়, সেই ভয়ে মায়েরা ছেলেমেয়ের মুখ প্রাণপণে চেপে ধরে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, খুব সাহসী পুরুষদেরও এমন সাহস হয় না যে, দরজাটা একটু খুলে ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, বাইরে কাদের আগমন হয়েছে।

তারপর বস্তির ভিতর থেকে পর পর দুজন লোক অদৃশ্য হল। তারা দুজনেই দুটো বিলিতি হোটেলে কাজ করত–বাসায় আসতে তাদের রাত হত। তারা যে কোথায় গেল, কেউ তা জানে না।

তারপর এক চৌকিদার রাত্রে এক ভয়ানক ব্যাপার দেখলে। একতলা ছাদ-সমান উঁচু মস্ত বড় এক ছায়ামূর্তি বস্তির একটা পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চৌকিদারের বুকের পাটা ছিল খুব। ছায়ামূর্তিটাকে দেখেও সে ভাবলে, বোধহয় তার চোখের ভ্রম! ভালো করে দেখবার জন্যে সে দু-পা এগিয়ে গেল। অমনি ছায়ামূর্তিটা তাকে লক্ষ করে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছুঁড়ে মারলে। ভাগ্যক্রমে পাথরখানা তার গায়ে লাগল না! চৌকিদার তখনি যত জোরে ছোটা উচিত, তত জোরেই ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। পরদিনই সে চৌকিদারি কাজ ছেড়ে দিলে!

এইসব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে এক সাহেব কৌতূহলী হয়ে বস্তির ভিতরে রাত কাটাতে এল। রাত্রে কি ঘটল, কেউ তা জানে না। সকালে দেখা গেল, বস্তির পথে সাহেবের টুপি আর হাতের বন্দুক পড়ে রয়েছে, কিন্তু সাহেবের চিহ্নমাত্র নেই!

পরশু আর একজন ভুটিয়া বাসায় ফিরে আসেনি! কিন্তু যাদের বাড়িতে সে কাজ করত তারা বলেছে, রাতে সে বাসার দিকেই এসেছে। এখন পর্যন্ত তার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তার মা-বোন-বউ কাঁদছে।

পুলিশের লোকেরা রোজ আসে। দিনের বেলায় তারা বুদ্ধিমানের মতো অনেক পরামর্শ করে, অনেক উপদেশ দেয় আর রাতে পাহারা দিতেও নাকি কসুর করে না। কিন্তু তারা পাহারা দেয় বোধহয় ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে। কারণ, এখনও গভীর রাতে প্রায়ই বস্তির পথে মহস্তির মতো কাদের ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায়। রাত্রে এই দেবতা না অপদেবতাদের অনুগ্রহ, আর দিনেরবেলায় পুলিশের জাঁকজমক খানাতল্লাশ, বাবুসাহেব, আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি! বস্তি ছেড়ে দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে।

.

চার । রাত্রের বিভীষিকা

বিমল ও কুমার বাসায় বসে বসে মাঝে মাঝে স্যান্ডউইচে কামড় ও মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালার চুমুক দিচ্ছিল। দুইজনেরই মন খারাপ, কারুর মুখেই কথা নেই। বাঘা অতশত বোঝে না, কখন চিকেন-স্যান্ডউইচের একটুখানি প্রসাদ তার মুখের কাছে এসে পড়বে সেই মধুর আশাতেই সে বিমল ও কুমারের মুখের পানে বারংবার লোভের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে!

বিনয়বাবু বাসায় নেই। সুরেনবাবু এখানকার একজন বিখ্যাত লোক–বহুকাল থেকে দার্জিলিংয়েই স্থায়ী। এখানে এসে তার সঙ্গে বিনয়বাবুর অল্পস্বল্প আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সুরেনবাবু আজ হঠাৎ কি কারণে বিনয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চায়ের পেয়ালার শেষ চুমুক দিয়ে কুমার বললে, বিনয়বাবুর ফিরতে তো বড় বেশি দেরি হচ্ছে!

বিমল বললে, হুঁ। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। তাঁকে নিয়ে সুরেনবাবুর এমনকী দরকার?

কুমার বললে, এদিকে আমাদের বেরুবার সময় হয়ে এল, বন্দুকগুলো সাফ করা হয়েছে কিনা দেখে আসি।

বিমল বললে, কেবল বন্দুক নয় কুমার! প্রত্যেকের ব্যাগে কিছু খাবার, ছোরা-ছুরি, ইলেকট্রিক টর্চ, খানিটা পাকানো দড়ি–অর্থাৎ হঠাৎ কোনও বিপজ্জনক দেশে যেতে হলে আমরা যে-সব জিনিস নিয়ে যাই, তার কিছুই ভুললে চলবে না।

কুমার বললে, আমরা তো দূরে কোথাও যাচ্ছি না, তবে মিছিমিছি এমন মোট বয়ে লাভ কি?

বিমল বললে, কুমার, তুমিও বোকার মতন কথা কইতে শুরু করলে? ..মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার এক মিনিট আগেও আমরা কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলুম, কোথায় কোথায় যেতে হবে? প্রতি মুহূর্তে যাদের মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে হয়, তাদের কি অসাবধানতার নিশ্চিন্ত আনন্দ ভোগ করবার সময় আছে?

কুমার কোনও জবাব দিতে পারলে না, লজ্জিত হয়ে চলে গেল। এমন সময় বিনয়বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন।

বিমল কিছু বললে না, বিনয়বাবু কি বলেন তা শোনবার জন্যে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবু প্রথমটা কিছুই বললেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের চারিদিকে খানিকটা ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বিমলের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, বিমল, বিমল! সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যা শুনলুম, তা ভয়ানক অতি ভয়ানক!

বিমল বললেন, আপনি কী শুনেছেন?

বিনয়বাবু বললেন, মৃণুর জন্যে আর আমাদের খোঁজাখুঁজি করে কোনও লাভ নেই।

তার মানে?

মৃণুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কেন?

সুরেনবাবু বললেন, পঁচিশ বছর আগে দার্জিলিংয়ের আর-একবার একটি মেয়ে চুরি গিয়েছিল। সে মেম! সেই সময়ও এখানে নাকি মানুষ চুরির এইরকম হাঙ্গামা হয়। সেই মেয়ের সঙ্গে নাকি বিশ-পঁচিশজন পুরুষেরও আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আপনি কি মনে করেন, তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক আছে?

আমার তো তাই বিশ্বাস। এইসব কথা বলবার পর সুরেনবাবু এই লেখাটুকু দিলেন। পুরোনো ইংরেজি কাগজ ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ থেকে এটি তিনি কেটে রেখেছিলেন।

বিনয়বাবুর হাত থেকে কাগজখানি নিয়ে বিমল যা পড়লে তার সারমর্ম এইঃ

হিমালয়ে এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রথম এভারেস্ট অভিযানে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরাও ফিরে এসে এদের কথা বলেছেন। তারা স্বচক্ষে এদের দেখেননি বটে, কিন্তু হিমালয়ের বরফের গায়ে এদের আশ্চর্য পায়ের দাগ দেখে এসেছেন। সে-সব পায়ের দাগ দেখতে মানুষের পদচিহ্নের মতন বটে, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষেরও পায়ের দাগ তেমন মস্ত হয় না। স্থানীয় লোকেরা বলে, হিমালয়ের কোনও অজানা বিজন স্থানে বিচিত্র ও অমানুষিক সব দানব বাস করে। কখনও কখনও তারা রাত্রে গ্রামের আনাচে কানাচে এসে বড় বড় পাথর ছোড়ে। গভীর রাত্রে কখনও কখনও তাদের গলার আওয়াজও শোনা যায়। তারা মানুষের সামনে বড় একটা আসে না এবং

মানুষেরাও তাদের সামনে যেতে নারাজ, কারণ সবাই তাদের যমের চেয়েও ভয় করে। তাদের কথা তুললেই হিমালয়ের গ্রামবাসীরা মহাআতঙ্কে শিউরে ওঠে। (আমরা যা বললুম, তা মনগড়া মিথ্যা কথা নয়। অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিকপত্র ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের পুরোনো ফাইল খুঁজলে সকলেই এর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারবেন। ইতি।-লেখক।)।

বিমল বললে, কাগজে যাদের কথা বেরিয়েছিল, কাল আমরাও বোধহয় তাদেরই কোনও কোনও জাতভাইয়ের খোঁজ পেয়েছি।

বিনয়বাবু বললেন, বোধহয় কেন বিমল, নিশ্চয়! হুঁ, আমরা নিশ্চয় তাদেরই কীর্তি দেখে এসেছি।

মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে, অথচ তা অমানুষিক! আর, অমানুষিক সেই মাথার চুল। আর, অমানুষিক সেই অট্টহাসি! এদেরও অভ্যাস, বড় বড় পাথর ছোঁড়া। কে এরা, কে এরা, কে এরা? বলতে-বলতে বিমল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে।-কুমার। রামহরি! বাঘা!

কুমার ও রামহরি তখনি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল-তাদের পিছনে পিছনে বাঘা! পশু বাঘা, বুদ্ধিমান বাঘা,-সে কুকুর হলে কি হয়, তারও মুখে যেন আজ মানুষের মুখের ভাব ফুটে উঠেছে,-তাকে দেখলেই মনে হয় বিমলের ডাক শুনেই সে যেন বুঝতে পেরেছ যে, আজ তাকে বিশেষ কোনও দরকারি কাজ করতে হবে! সোজা বিমলের পায়ের কাছে এসে বাঘা বুক ফুলিয়ে এবং ল্যাজ তুলে দাঁড়াল-যেন সে বলতে চায়,-কী হুকুম হুজুর! গোলাম প্রস্তুত।

আদর করে বাঘার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বিমল বললে, কুমার! আমাদের জিনিসপত্তর সব তৈরি!

কুমার বললে, হ্যাঁ, বিমল!

বিমল বললে, আর একটু পরেই সন্ধে হবে। কিন্তু তার আগেই আমি ভুটিয়া বস্তিতে গিয়ে হাজির হতে চাই। আজ সারারাত সেইখানেই আমরা পাহারা দেব।

.

ভুটিয়া-বস্তির প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব যে-দিক দিয়ে Pandam Tea Estate-এ যাওয়া যায়, সেইখানে এসে বিমল বললে, আজ সকালে এখানেই ভুটিয়াদের কান্নাকাটি শুনে গিয়েছি। আজ এইখানেই পাহারা দিয়ে দেখা যাক, কী হয়!...কিন্তু সকলে এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে খানিকখানিক তফাতে গিয়ে বসে পাহারা দেব। তাহলে অনেকখানি জায়গাই আমাদের চোখের ভিতরে থাকবে। আজ সারারাত ঘুমের কথা কেউ যেন ভেব না। দরকার হলেই বন্দুক ছুঁড়বে। রামহরি! বাঘাকে তুমি আমার কাছে দিয়ে যাও!

.

সন্ধ্যা গেল তার আবছায়া নিয়ে, রাত্রি এল তার নিরেট অন্ধকার নিয়ে। অন্য সময় হলে কাছে ওই ভুটিয়া-বস্তি থেকে হয়তো এখন অনেক রকম শব্দ বা গান-বাজনার ধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু আজ সমস্ত পল্লী যেন গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ,–যেন ওখানে কোনও জীবই বাস করে না! শ্মশানে তবু মড়ার চিতা জ্বলে, কিন্তু ওখানে আজ একটিমাত্র আলোকবিন্দুও দেখা যাচ্ছে না! যেন ওখানে আজ কোনও কালো নিষ্ঠুর অভিশাপ অন্ধকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে নীরবে কোনও অজানা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন নিয়ে মারাত্মক খেলা করছে!

বিমলের মনে হতে লাগল, এই অন্ধকারে পাহারা দিয়ে কোনওই লাভ নেই! যদি এরই ভিতর দিয়ে কোনও ভীষণ মূর্তি নিঃশব্দে পা ফেলে চলে যায়, তবে কোনও মানুষের চক্ষুই তা দেখতে পাবে না।

.

নিশুত রাতের বুক যেন ধুকপুক করছে। বরফ-মাখা কনকনে হাওয়া যেন মৃতদেহের মতো ঠান্ডা। দূর থেকে ভুটিয়াদের বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল–এ পবিত্র ঘণ্টা বাজে দুষ্ট প্রেতাত্মাদের তাড়াবার জন্যে। কিন্তু পাহাড়ে রাতের প্রেতাত্মারা ঘণ্টাধ্বনি শুনলে সত্যই কি পালিয়ে যায়? তবে আচম্বিতে ওখানে অমন অপার্থিব ধ্বনি জাগছে কেন?...না, এ হচ্ছে গাছের পাতার বাতাসের আর্তনাদ। রাতের আত্মা কি কাঁদছে? রাতের প্রাণ কি ছটফট করছে? রাত্রি কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

এমনি সব অসম্ভব পাগলামি নিয়ে বিমলের মন যখন ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন অকস্মাৎ বাঘা ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে গরর গরর করে উঠল।

বিমলও তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল, চারিদিকে তীব্র ও তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলে না,–চতুর্দিকে যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই! বাঘার গলায় হাত রেখে সে বললে, কিরে বাঘা, চাঁচালি কেন? আমার মতন তুইও কি দুঃস্বপ্ন দেখছিস?

বিমলের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই স্তব্ধ রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে কে অতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, বিমল! কুমার! রক্ষা করো! রক্ষা করো!

বিমলের বুক স্তম্ভিত হয়ে গেল,–এ যে বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর!

.

পাঁচ। অরণ্যের রহস্য

বিনয়বাবুর গলার আওয়াজ! কী ভয়ানক বিপদে পড়ে এত যন্ত্রণায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন? কিন্তু কালো রাত আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল, বিনয়বাবু আর চিৎকার করলেন না।

লুকানো জায়গা থেকে বিমল একলাফে বেরিয়ে এল–বাঘা তার আগেই দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছে। অন্যদিক থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে বিমল বুঝলে, কুমার আর রামহরিও ছুটে আসছে।

কিন্তু কোনদিকে যেতে হবে? এই ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না, বিপদের আবির্ভাব হয়েছে যে ঠিক কোন জায়গায়, তা স্থির করা এখন অসম্ভব বললেই চলে।

বিমল তখন বাঘার পশুশক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝলে, পশু বাঘার যে শক্তি আছে, মানুষের তা নেই। পশুর চোখ অন্ধকারে মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ তো বটেই, তার উপরে ঘ্রাণশক্তি তাকে ঠিক পথেই চালনা করে।

রামহরি বিজলী-মশাল জ্বালতেই বিমল বাধা দিয়ে বললে, না, না, এখন আলো জ্বেলো না, শত্রু কোনওদিকে তা জানি না, এখন আলো জ্বাললে আমরাই ধরা পড়ে মরব!

তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকারের রহস্যের ভিতরে তাকিয়ে তারা তিনজনে অত্যন্ত সজাগ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল–তাদের কাছে এখন প্রত্যেক সেকেন্ড যেন এক এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না–মিনিটখানেক পরেই হঠাৎ বাঘার ঘন ঘন গর্জনে নীরব কালো রাতের ঘুম আবার ভেঙে গেল।

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, বাঘা খোঁজ পেয়েছে। ওইদিকে–ওইদিকে! রামহরি, টর্চ জ্বেলে আগে আগে চলো। কুমার, আমার সঙ্গে এসো!

রামহরির পিছনে পিছনে বিমল ও কুমার বন্দুক বাগিয়ে ধরে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, ঝোপের পাশেই একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে।

কুমার বললে, বিনয়বাবুর বন্দুক। কিন্তু বিনয়বাবু কোথায়?

রামহরি তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং পরমুহূর্তেই আকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল–ভূত। খোকাবাবু!

আচম্বিতে এই অপ্রত্যাশিত চিৎকার বিমল ও কুমারকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে। কিন্তু তারপরেই নিজেদের সামলে নিয়ে বিজলি মশাল জ্বেলে তারাও এক এক লাফে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

দুই হাতে মুখ চেপে রামহরি মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

বাঘা ছুটে জঙ্গলের আরও ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমার টপ করে তার গলার বগলস চেপে ধরলে। বাঘা তবু বশ মানলে না, ছাড়ান পাওয়ার জন্যে পাগলের মতন ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

বিমল চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু বিনয়বাবুর কোনও চিহ্ন বা ভয়-পাওয়ার মতো অন্য কিছুই তার নজরে ঠেকল না।

কুমার বললে, রামহরি! কী হয়েছে তোমার? কী দেখেছ তুমি?

রামহরি ফ্যালফ্যালে চোখে বোবার মতো একবার কুমারের মুখের পানে চাইলে এবং তারপরে জঙ্গলের একদিকে আঙুল তুলে দেখালে। তখনও সে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

বিমল বললে, অমন ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে আছ কেন? ওখানে কী আছে?

রামহরি খালি বললে, ভূত!

ভূত! তোমার ভূতের নিকুচি করেছে। দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি-এই বলে বিমল সেইদিকে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না! খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওদিকে যেয়ো না!

কেন? ওদিকে কী আছে!

ভূত! রাক্ষস! দৈত্য কি দানব। যাকে দেখেছি সে যে কে, তা আমি জানি না- কিন্তু সে মানুষ নয়, খোকাবাবু, মানুষ নয়।

বিমল খুব বিরক্ত হয়ে বললে, আর তোমার পাগলামি ভালো লাগে না রামহরি। হয় যা দেখেছ স্পষ্ট করে বলো, নয়, এখান থেকে বিদেয় হও।

রামহরি বললে, সত্যি বলছি খোকাবাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করো। যেই আমি জঙ্গলের ভেতর এলুম, অমনি দেখলুম, জয়ঢাকের চেয়েও একখানা ভয়ানক মুখ সাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে সরে গেল।

খালি মুখ?

হ্যাঁ, খালি মুখতার আর কিছু আমি দেখতে পাইনি। ঝকড়া আঁকড়া চুল আর আমার এই হাতের চেটোর মতো বড় বড় আগুন-ভরা চোখ,বাপরে, ভাবতেও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কুমার বললে, কিন্তু সে মুখের কথা এখন থাক! বিমল, বিনয়বাবু কোথায় গেলেন?

আমিও সেই কথাই ভাবছি। তার চিৎকার আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁর বন্দুকটাও এখানে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?

হঠাৎ খানিক তফাতে জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত শব্দ উঠল-যেন বিরাট একটা রেল ইঞ্জিনের মতন অসম্ভব দেহ জঙ্গলের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে বেগে এগিয়ে চলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে বাঘার ঘেউঘেউ-ঘেউ! এবং রামহরির আর্তনাদ-ওই শোনো খোকাবাবু, ওই শোনো!

গাছপালার মড়মড়ানি ও ভারী ভারী পায়ের ধুপধুপুনি শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। বিমল বললে, এখানে যে ছিল, সে চলে গেল!

কুমার বললে, কিন্তু বিনয়বাবুর কোনও সন্ধানই তো পাওয়া গেল না।

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই অনেকদূর থেকে শোনা গেল বিমল! বিমল! কুমার! রক্ষা করো রক্ষা করো! বিমল! বি- হঠাৎ আর্তনাদটা আবার থেমে গেল।

কুমার বললে, বিমল-বিমল! ওই তো বিনয়বাবুর গলা!

বিমল বললে, কুমার, বিনয়বাবু নিশ্চয়ই দানবের হাতে বন্দি হয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন কি হবে বিমল, আমরা কী করব?

আমরা?..আমরা শত্রুর পিছনে পিছনে যাব-বিনয়বাবুকে উদ্ধার করব!

কিন্তু কোনদিকে যাব? পৃথিবীতে এক ফোঁটা আলো নেই, আকাশ যেন অন্ধকার বৃষ্টি করছে! কে আমাদের পথ দেখাবে?

বাঘা। শত্রুর পায়ের গন্ধ সে ঠিক চিনতে পারবে বাঘা যে শিক্ষিত কুকুর! তুমিও ওর গলায় শিকল বেঁধে ওকে আগে আগে যেতে দাও, আমরা ওর পিছনে থাকব। রামহরি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে, না বাসায় ফিরে যাবে?

রামহরি বললে, তোমরা যেখানে থাকবে, সেই তো আমার বাসা! তোমাদের সঙ্গে ভূতের বাড়ি কেন, যমের বাড়ি যেতেও আমি নারাজ নই।

হ্যাঁ রামহরি, হয়তো আজ আমরা যমের বাড়ির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। মন্দ কি, পারি তো যমের একখানা ফোটো তুলে নিয়ে আসব।

রামহরি গজগজ করে বললে, যত সব অনাছিষ্ট কথা!

বিমলের কথা মিথ্যা নয়। বাঘার নাকই অন্ধকারে তাদের চোখের কাজ করলে। বাঘা কোনওদিকে ফিরে তাকালে না, মাটির উপরে নাক রেখে সে বেগে অগ্রসর হতে লাগল। কুমার তার গলার শিকলটা না ধরে রাখলে এতক্ষণে সে হয়তো আরও বেগে তিরের মতো ছুটে নাগালের বাইরে কোথায় চলে যেত!

তিনজনে বাঘার পিছনে পিছনে অতি কষ্টে পথ চলতে লাগল।

কুমার বললে, বনের ভেতরে রামহরি যাকে দেখেছে, তার বর্ণনা শুনে মনে হল সে এক সাংঘাতিক জীব!

রামহরি শিউরে উঠে বললে, তার কথা আর মনে করিয়ে দিও না বাবু, তাহলে হয়তো আমি ভিরমি যাব! উঃ, মুখখানা মানুষের মতো দেখতে বটে, কিন্তু হাতির মুখের চেয়েও বড়!

অমন ভয়ানক যার মুখ, আমাদের দেখেও সে আক্রমণ করলে না কেন?

বিমল বললে, হয়তো আমাদের হাতের ইলেকট্রিক টর্চ দেখে সে ভড়কে গেছে।

কুমার বললে, আশ্চর্য নয়। মোটরের হেড-লাইট দেখে অনেক সময়ে বাঘ-ভল্লুকও হতভম্ব হয়ে যায়!

আবার তারা নীরবে অগ্রসর হতে লাগল।

.

এইভাবে ঘণ্টা-তিনেক দ্রুতপদে এগিয়ে তারা যে কোথায়, কোনদিকে, কতদূরে এসে পড়ল, কেউ তা বুঝতে পারলে না। এবং এইভাবে আর বেশিক্ষণ বাঘার সঙ্গে চলা যে তাদের পক্ষে অসম্ভব, এটুকু বুঝতেও তাদের বাকি রইল না। এরই মধ্যে বারবার হোঁচট খেয়ে পাথরের উপরে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গ থেঁতো হয়ে গেছে, গায়ের কত জায়গায় কত

কাটা বিঁধেছে, ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে জামা কাপড়ের আর পদার্থ নেই! তাদের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, দম বুঝি। আর থাকে না!

এইবারে তারা একটা বড় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করল। সকলে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনওগতিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হল। তারপর রামহরি বললে, খোকাবাবু, আমি তো তোমাদের মতন জোয়ান ছোকরা নই, আমাকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও!

বিমল বললে, রামহরি, কেবল তোমারই নয়, আমারও বিশ্রাম দরকার হয়েছে, আমিও এই বসে পড়লুম।

কুমারের অবস্থাও ভালো নয়, সেও অবশ হয়ে ধুপ করে বসে পড়ল।

কিন্তু বাহাদুর বটে বাঘা! যদিও দারুণ পরিশ্রমে তার জিব মুখের বাইরে বেরিয়ে পড়ে লকলক করে ঝুলছে, তবু এখনও তার এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ একটুও কমেনি।

কুমার চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বললে, মনে হচ্ছে, আজকের এই অন্ধকারের অন্ধতা কখনও দূর হবে না, আজকের এই অনন্ত রাতের বিভীষিকা কখনও শেষ হবে না।

রামহরি বললে, একটা জানোয়ারের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বড় হয় রামহরি। ভগবান মানুষকে বঞ্চিত করে এমন কোনও কোনও শক্তি পশুকে দিয়েছেন, যা পেলে মানুষের অনেক উপকারই হত!

আচম্বিতে সেই বোবা অন্ধকার, কালো রাত্রি এবং স্তব্ধ অরণ্য যেন ভীষণ ভাবে জ্যান্ত হয়ে উঠল।-ও কী খোকাবাবু, ও কী বলতে, বলতে রামহরি আঁতকে দাঁড়িয়ে উঠল।

বাঘা চেঁচিয়ে এবং চমকে চমকে উঠে শিকল ছিঁড়ে ফেলে আর কি!

বিমল ও কুমার সন্ত্রস্ত হয়ে শুনতে লাগল–তাদের সামনে, পিছনে, ডানপাশে, বামপাশে, কাছে, দুরে চারিদিক থেকে যেন চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় স্টিমার কান ফাটিয়ে প্রাণ দমিয়ে ক্রমাগত কু দিচ্ছে–যেন বনবাসী অন্ধকারের চিৎকার, যেন সদ্যজাগ্রত অরণ্যের হুঙ্কার, যেন বিশ্বব্যাপী ভূত-প্রেতের গর্জন!

.

ছয় । অজগরের মতন হাত

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাকো, তারা জানো বোধ হয়, নিউ ইয়াস ডের রাত্রি দুপুরের সময় গঙ্গানদীর স্টিমারগুলো একসঙ্গে এমন ভে দিয়ে ওঠে যে, কান যেন ফেটে যায়।

হিমালয়ের পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে এই ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে বিমল, কুমার ও রামহরির চারিদিক থেকে এখন অনেকটা তেমনিধারা বিকট চিৎকারই জেগে উঠেছে। তবে স্টিমারের ভো-দেওয়ার ভিতরে ভয়ের ব্যাপার কিছু নেই, কিন্তু এখানকার এই অস্বাভাবিক কোলাহলে অবর্ণনীয় আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ যেন ছটফট করতে লাগল।

আর,–এ চিৎকার কোনও যন্ত্রের চিৎকার নয়, এ ভয়াবহ চিৎকারগুলো বেরিয়ে আসছে অজানা ও অদৃশ্য সব অতিকায় জীবের কণ্ঠ থেকেই! দুশো-আড়াইশো সিংহ একসঙ্গে গর্জন। করলেও তা এতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হত না!

প্রথমটা সকলেই কী করবে ভেবে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিক থেকেই সেই বিকট চিৎকার উঠছে, কাজেই কোনওদিকেই পালাবার উপায় নেই!

কুমারের মনে হল, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দৈত্য দানবের মতো কারা যেন চাঁচাতে চাঁচাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে– ক্রমেই এগিয়ে আসছে তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের আর কোনও উপায় নাই।

হঠাৎ বিমল বলে উঠল, কুমার উঠে দাঁড়াও। হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে থাকবার সময় নয়। বন্দুক ছোঁড়ো, যা থাকে কপালে!

বিমল ও কুমার লক্ষ্যহীন ভাবেই অন্ধকারের ভিতর গুলির পর গুলি চালাতে লাগল, তাদের দেখাদেখি রামহরিও সব ভয় ভুলে বন্দুক ছুঁড়তে কসুর করলে না।

শত্রুদের বিকট চিল্কারের সঙ্গে তিন-তিনটে বন্দুকের গর্জন মিলে চারিদিকটা যেন শব্দময় নরক করে তুললে–কাজেই বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে কেউ আর্তনাদ করলে কি না, সেটা কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গোলমাল একেবারে থেমে গেল।

অন্ধকারের ভিতরে আরও কয়েকটা গুলি চালিয়ে বিমল বললে, আমাদের ভয় দেখাতে এসে হতভাগারা এইভাবে নিজেরাই ভয়ে পালিয়েছে। বন্দুকের এমনি মহিমা!

কুমার বললে, মিছেই তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। লোকে যা বলে, তাদের চেহারা যদি সেই রকমই হয়, তাহলে তাদের ভয় পাওয়ার কোনওই কারণ ছিল না। তারা দল বেঁধে আক্রমণ করলে আমাদের বন্দুক কিছুই করতে পারত না।

বিমল বললে, কুমার, কেবল মস্তিষ্কের জোরেই মানুষ আজ জীবরাজ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। আদিমকালে পৃথিবীতে যারা প্রভুত্ব করত, সেইসব ডাইনসরের তুলনায় মানুষ কত তুচ্ছ! তাদের নিশ্বাসেই বোধ হয় মানুষ পোকা-মাকড়ের মতো উড়ে যেত। কিন্তু তবু তারা দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারেনি। একালের হাতি, গন্ডার, হিপো, সিংহ, ব্যাঘ্র–এমনকী, ঘোড়া-মোষ-গরু পর্যন্ত গায়ের জোরে মানুষের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু তবু তারা মানুষকে ভয় করে এবং গোলামের মতো মানুষের সেবা করে। গায়ের জোরের অভাব মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা পূরণ করে নিয়েছে। আমাদের হাতে যে বন্দুকগুলো আছে, আর আমাদের ব্যাগে যে বোমাগুলো আছে এগুলো দান করেছে মানুষের মস্তিষ্কই। আজ

যে-সব জীবের পাল্লায় আমরা পড়েছিলুম, তারা যত ভয়ানকই হোক, সভ্য মানুষের মস্তিষ্ক তাদের মাথায় নেই। তারা আমাদের ভয় করতে বাধ্য।

রামহরি বিরক্ত স্বরে বলল, খোকাবাবু বোমা-টোমা তুমি আবার সঙ্গে করে এনেছ কেন? শেষকালে কি পুলিশের হাতে পড়বে?

কুমার হেসে বললে, ভয় নেই রামহরি, তোমার কোনও ভয় নেই। দুষ্ট রাজবিদ্রোহীদের মতো আমরা যে মানুষ মারবার জন্যে বোমা ছুড়ব না, পুলিশ তা জানে। পুলিশকে লুকিয়ে আমরা বোমা আনিনি–আমরা পুলিশের অনুমতি নিয়েই এসেছি!

বিমল বললে, পূর্বদিকে একটু একটু করে আলো ফুটছে, ভোর হতে আর দেরি নেই। সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম করে, তারপর আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

কুমার বললে, বিমল, শুনতে পাচ্ছ? কাছেই কোথায় জলের শব্দ হচ্ছে!

বিমল বললে, হুঁ! বোধ হয় আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এখন সে-সব ভাবনা ভুলে ঘণ্টাখানেকের জন্যে চোখ মুদে নাও। বাঘা ঠিক পাহারা দেবে।

.

সকালের আলোয় সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

বিমল উঠে বসে চেয়ে দেখলে, তার চারিদিকে শাল ও দেবদারু এবং আরও অনেক রকম গাছের ভিড়। গাছের তলায় তলায় লতা-গুল্ম ভরা ঝোপঝাঁপ। নীল আকাশ দিয়ে সোনার জলের মতো সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে। মিষ্টি বাতাসে পাখনা কাঁপয়ে প্রজাপতিরা আনাগোনা করছে রংবেরঙের ফুলের টুকরোর মতো! দার্জিলিংয়ের চেয়ে এখানকার হাওয়া অনেকটা গরম।

কালকের নিবিড় অন্ধকারে যে-স্থানটা অত্যন্ত ভীষণ বলে মনে হচ্ছিল, আজকের ভোরের আলো তাকেই যেন পরম শান্তিপূর্ণ করে তুলেছে।

বিমল ও কুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে গেল। স্থানে স্থানে লতাগুল্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে–যেন তাদের উপর দিয়ে খুব ভারী কোনও জীব চলে গিয়েছে। এক জায়গায় অনেকখানি পুরু রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

কুমার বললে, বিমল, আমাদের বন্দুক ছোঁড়া তাহলে একেবারে ব্যর্থ হয়নি! দেখো, দেখো, এখানে রক্তমাখা সেইরকম মস্ত মস্ত পায়ের দাগও রয়েছে যে! দাগগুলো সামনে জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়েছে।

আচম্বিতে পিছন থেকে শোনা গেল, বাঘার বিষম চিৎকার!

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, বাঘা তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি তাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে এসেছি। হঠাৎ কি দেখে সে চাঁচালে?

দুজনে ত্রস্তপদে ফিরে এসে দেখলে, বাঘা ক্রমাগত চিৎকার করছে এবং শিকলি-বাঁধা অবস্থায় মাঝে মাঝে পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে!

বিমল বললে, রামহরিও তো এইখানেই শুয়েছিল। রামহরি কোথায় গেল? রামহরি!..রামহরি!...রামহরি!

কিন্তু রামহরির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কুমার ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, তবে কি তারা রামহরিকেও চুরি করে নিয়ে গেল?

বিমল বললে, কুমার। বাঘাকে এগিয়ে দাও! শত্রু কোনদিকে গেছে, বাঘা তা জানে।

কুমার ও বিমলের আগে আগে বাঘা আবার এগিয়ে চলল, মাটির উপরে নাক রেখে।

কুমার বললে, বিমল, যে শত্রুদের পাল্লায় আমরা পড়েছি, তাদের তুমি মানুষের চেয়ে তুচ্ছ মনে কোরো না। দেখো, এরা প্রায় আমাদের সুমুখে থেকেই উপরি-উপরি বিনয়বাবু আর রামহরিকে ধরে নিয়ে গেল, অথচ আমরা কিছুই জানতে পারলুম না। আমরা কি করছি না। করছি সমস্তই ওরা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ করছে, অথচ আমরা তাদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি অসহায় অন্ধের মতো। এইবারে আমাদের পালা বিমল, এইবারে আমাদের পালা।

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, দেখা যাক!

তারা একটি ছোট নদীর ধারে এসে পড়ল, শিশুর মতো নাচতে নাচতে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে স্বচ্ছ জলের ধারা তরতর করে বয়ে যাচ্ছে!

নদীর ধারে এসে বাঘা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ব্যস্তভাবে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল–যেন সে বলতে চায়, শত্রুর পায়ের গন্ধ জলে ডুবে গেছে, এখন আমায় আর কী করতে হবে বলো?

বিমল বললে, আমরা রঙ্গু নদীর তীরে এসে পড়েছি। এটা রঙ্গিত নদীর একটি শাখা।

কুমার বললে, এ জায়গাটা দার্জিলিং থেকে কত দূরে?

বিমল বললে, এখান থেকে দার্জিলিং এগারো-বারো মাইলের কম হবে না। আরও কিছুদূর এগুলেই আমরা সিকিম রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পড়ব।

কুমার বললে, এখন আমাদের উপায়? বাঘা তো শত্রুদের পায়ের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। এখন আমরা কোনদিকে যাব?

বিমল বললে, পায়ের গন্ধ বাঘা এই নদীর ধারে এসেই হারিয়ে ফেলেছে। এই দেখ শত্রুদের পদচিহ্ন। তারা নদীর ওপারে গিয়ে উঠেছে। এই তো এতটুকু নদী, আমরা

অনায়াসে ওপারে যেতে পারব। বলেই বিমল জলে নেমে পড়ল, তার সঙ্গে সঙ্গে নামল বাঘাকে নিয়ে। কুমারও।

নদীর ওপারে উঠেই মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বিমল বললে, এই দেখো, আবার সেই অমানুষিক পায়ের চিহ্ন।

বাঘাও তখনি হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার খুঁজে পেলে। গা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার সে ছুটে চলল।

কিন্তু বিমল তার শিকল চেপে ধরে বললে, বাঘা, দাঁড়া!..কুমার! এখনও আমাদের কত দুরে কতক্ষণ যেতে হবে, কে তা জানে? পথে হয়তো জলও পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি এখানে বসে মুখে কিছু দিয়ে জল পান করে ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়ে তারপর আবার শত্রুদের পিছনে ছুটব! কি বলো?

কুমার বললে, খেতে এখন আমার রুচি হচ্ছে না!

বিমল বললে, খাবার ইচ্ছে আমারও নেই, কিন্তু শরীরের ওপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে, না খেলে একটু পরেই সে যে ভেঙে পড়বে। খানকয় স্যান্ড উইচ আছে, টপটপ করে খেয়ে ফেলো। এই নে বাঘা, তুইও নে।

আবার তারা এগিয়ে চলল–সর্বাগ্রে বাঘা, তারপর কুমার, তারপর বিমল।

খানিক পরে তারা পাহাড়ের যে অংশে এসে পড়ল, সেদিক দিয়ে মানুষের আনাগোনা করার কোনও চিহ্ন নেই। অন্তত মানুষের আনাগোনা করার কোনও চিহ্ন তাদের নজরে ঠেকল না। যদিও কোথাও মানুষের সাড়া বা চিহ্ন নেই, তবুও বনের ভিতর দিয়ে পথের মতন একটা কিছু রয়েছে বলেই তারা এখনও অগ্রসর হতে পারছিল। এখান দিয়ে চলতে-চলতে যদিও বেত ও নানা কাটাগাছ দেহকে জড়িয়ে ধরে, ঝুলেপড়া গাছের ডালে মাথা ঠুকে যায়, ছোট-বড় পাথরে প্রায় হোঁচট খেতে হয় এবং ঘাসের ভিতর থেকে বড় বড় জোঁক বেরিয়ে পা কামড়ে ধরে, অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এসবের চেয়ে বড় আর কোনও

বাধা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ বা ঝোপ উপড়ে বা ভেঙে ফেলে কারা যেন আনাগোনার জন্য পথ সাফ করে রেখেছে। এমনভাবে বড় বড় গাছগুলোকে উপড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে যে, দেখলেই বোঝা যায়, তা। মানুষের কাজ নয়। যে-সব অরণ্যে হাতির পাল চলাফেরা করে, সেইখানেই এমনভাবে ভাঙা বা উপড়ানো গাছ দেখা যায়। এখানে হাতিও নেই, মানুষও নেই,তবুও পথ চলবার বাধা সরিয়ে রেখেছে কারা?

এই প্রশ্ন মনে জাগতেই কুমারের বুকটা যেন শিউরে উঠল!

বেচারা রামহরি! তার সাহস ও শক্তির অভাব নেই, মূর্তিমান মৃত্যুর সামনেও সে কতবার হাসিমুখে ছুটে গিয়েছে। কিন্তু এক ভূতের ভয়েই সর্বদা সে কাতর হয়ে পড়ে। কিন্তু তার অদ্ভুত প্রভুভক্তি এই ভূতের ভয়কেও মানে না, তাই এত বড় বিপদের মাঝখানেও সে তাদের ছেড়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু এখন? এখন সে কোথায়? সে বেঁচে আছে কি না কে জানে।

একটা পাহাড়ের খানিকটা যেখানে পথের উপর ঝুঁকে আছে, সেইখানে বাঘা হঠাৎ ডানদিকে মোড় ফিরলে।

কুমারও সেইদিকে ফিরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে কি একটা শব্দ শুনেই চমকে উঠে আবার ফিরে দাঁড়াল এবং তারপর সে কী দৃশ্যই দেখল!

ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের উপর থেকে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো মোটা এবং কালো রোমশ একখানা হাত বিমলের মুখ ও গলা একসঙ্গে চেপে ধরে তার দেহকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

.

সাত । গুহামুখে

প্রথমটা কুমার বিস্ময়ে এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল যে, ঠিক কাঠের পুতুলের মতোই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের হাতের মতন দেখতে কোনও হাত যে এত মস্ত হতে পারে,

মানুষী স্বপ্নেও বোধহয় তা কল্পনা করা অসম্ভব। একখানা মাত্র হাতের চেটোর ভিতরেই বিমলের গলা ও সমস্ত মুখখানা একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তার পরমুহূর্তেই বিমলের দেহ যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন কুমারের হুঁশ হল। কিন্তু বৃথা। তখন বিমল বা শত্রুর কোনও চিহ্নই নেই–কেবল ধুপধুপ করে ভারী পায়ের এক বনজঙ্গল ভাঙার শব্দ হল, তারপরেই সব আবার চুপচাপ।

দুই চক্ষে অন্ধকার দেখতে দেখতে কুমার অবশ হয়ে সেইখানে বসে পড়ল। তার প্রাণ মন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারলে না!

অনেকক্ষণ পরে তার মাথা একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে এল।

মৃণু তো সকলের আগেই গিয়েছে, তারপর গেলেন বিনয়বাবু, তারপর রামহরি, তারপর বিমল। বাকি রইল এখন কেবল সে নিজে। কিন্তু তাকেও যে এখন ওই ভয়ংকর অজ্ঞাতের কবলে গিয়ে পড়তে হবে না, তাই-ই বা কে বলতে পারে?

শোকে কুমারের মনটা একবার হু-হু করে উঠল, কিন্তু সে জোর করে নিজের দুর্বলতা দমন করে ফেললে। এরকম অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে অচল হয়ে বসে যারা শোক বা হাহাকার করে, তারা হচ্ছে পঙ্গু বা কাপুরুষ। কুমার কোনওদিন সে দলে ভিড়বে না।

তার আশেপাশে লুকিয়ে আছে যে-সব জীব, তাদের অমানুষিক কণ্ঠের চিৎকার সে শুনেছে, তাদের বিরাট পায়ের দাগও সে মাটির উপরে দেখেছে এবং তাদের একজনের অভাবিত একখানা হাতও এইমাত্র তার চোখের সুমুখ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুমার বেশ। ভালো করেই বুঝতে পারলে যে, যাদের হাত-পা ও কণ্ঠস্বর এমনধারা, তাদের সামনে একাকী গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টাটা হবে কালবোশেখি ঝড়ের বিরুদ্ধে একটা মাছির তুচ্ছ চেষ্টার মতোই হাস্যকর! এমন অবস্থায় কোনও সাহসী ও বলিষ্ঠ লোকও যদি প্রাণ হাতে করে ফিরে আসে, তাহলে কেউ তাকে কাপুরুষ বলতে পারবে না।–একথাটাও তার মনে হল। কিন্তু তখনই সে-কথা ভুলে কুমার নিজের মনে-মনেই বললে, মানুষের কাছে

একটা খুদে লাল পিঁপড়ে কতটা নগণ্য! মানুষের একটা নিশ্বাসে সে উড়ে যায়! কিন্তু মানুষ যদি সেই তুচ্ছ লাল পিঁপড়ের গায়ে হাত দেয়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মানুষকে আক্রমণ করতে একটুও ভয় পায় না। আমিও ওই লাল পিঁপড়ের মতোই হতে চাই। বিমল যদি মারা পড়ে থাকে, তাহলে যে পৃথিবীতে বিমল নেই, আমিও সেখানে বেঁচে থাকতে চাই না! যে-পথে বিনয়বাবু গেছেন, রামহরি গেছে, বিমল গেছে, আমিও যাব সে-পথে। যদি প্রতিশোধ নিতে পারি, প্রতিশোধ নেব। যদি মৃত্যু আসে, মৃত্যুকে বরণ করব। কুমার উঠে দাঁড়াল।

বাঘাকে ধরে রাখা দায়! উপরকার পাহাড়ের যেখানে খানিক আগে শত্রু-হস্ত আবির্ভূত হয়েছিল, বিষম গর্জন করতে করতে বাঘা এখন সেইখানেই যেতে চায়! বারংবার হুমকি দিয়ে সে সমানের দিকে ঝুঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু তারপরেই শিকলে বাধা পেয়ে পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুমুখের দু-পায়ে যেন মহা আক্রোশে শূন্যকেই আঁচড়াতে থাকে কুমারের হাত থেকে শিকল খসে পড়ে আর কি!

কিন্তু কুমার শিকলটাকে হাতে পাকিয়ে ভালো করে ধরে রইল–সে বুঝলে, এই ভয়াবহ দেশে একবার হাতছাড়া হলে বাঘাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন বাঘাই তার একমাত্র সঙ্গীতার কাছ থেকে সে অনেক সাহায্যই প্রত্যাশা করে! এ-পথে এখন বাঘা তার শেষ বন্ধু!

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে কুমার উপরে উঠতে লাগল। খানিক পরেই বিমল যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে শত্রু বা মিত্র কারুর কোনও চিহ্নই নেই।

কুমার পায়ের তলায় পাহাড়ের গা তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করে দেখলে। কিন্তু রক্তের দাগ না দেখে কতকটা আশ্বস্ত হল।

সে এখন কী করবে? কোনদিকে যাবে? এখানে তো পথের বা বিপথের কোনও চিহ্নই নেই। যতদূর চোখ যায়, গাছপালা জঙ্গল নিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

কিন্তু কুমারকে কোনদিকে যেতে হবে, বাঘাই আবার তা জানিয়ে দিলে। এদিকে-ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বাঘা যে কীসের গন্ধ পেলে তা কেবল বাঘাই জানে, কিন্তু তারপরেই মাটির উপরে মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি সে আবার এগিয়ে চলল। একটুপরেই ঘন জঙ্গল তাদের যেন গিলে ফেললে!

অল্পদুর অগ্রসর হয়েই জঙ্গলের ভিতরে আবার একটা পায়েচলা পথ পাওয়া গেল। সে পথের উপরে বড় বড় গাছের ছায়া এবং দু-ধারে ঝোপঝাঁপ আছে বটে, কিন্তু পথটা যেখান দিয়ে গেছে, সেখান থেকে ঝোপঝাঁপ কারা যেন যতটা সম্ভব সাফ করে রেখেছে।

এইভাবে বাঘার সঙ্গে কুমার প্রায় ঘণ্টা-তিনেক পথ দিয়ে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু সারাপথে কেবল দু-চারটে বুনো কুকুর ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলে না। শত্রুরা এখনও লুকিয়ে তার উপর নজর রেখেছে কি না, সেটাও বুঝতে পারলে না। বিপুল পরিশ্রমে। তার শরীর তখন নেতিয়ে পড়েছে এবং এমন হাঁপ ধরেছে যে, খানিকক্ষণ না জিরিয়ে নিলে আর চলা অসম্ভব।

পথটা তখন একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে পড়েছে, সেখান থেকে নীচের দিকটা দেখাচ্ছে ছবির মতো।

সেইখানে বসে পড়ে কুমার ফ্লাস্ক থেকে জলপান করে আগে নিজের প্রবল তৃষ্ণাকে শান্ত করলে। বাঘাও করুণ ও প্রত্যাশী চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে তাকেও জলপান করতে দিলে।

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, সে কী দৃশ্য! একদিকে পর্বত-সমুদ্রের প্রস্তরীভূত স্থির তরঙ্গদল দৃষ্টিসীমা জুড়ে আছে এবং তারপরেই কাঞ্চনজঙ্ঘার সুগম্ভীর চির-তুষারের

রাজ্য! আর একদিকে বনশ্যামল পাহাড়ের দেহ পৃথিবীর দিকে দিকে নেমে গিয়েছে এবং উজ্জ্বল রুপোর একটি সাপের মতন রঙ্গিত-নদী এঁকেবেঁকে খেলা করতে করতে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, এত উঁচু থেকে তার কল-গীতিকা কানে আসে না।

আশেপাশে, কাছে-দূরে সরল ও সিন্দুর গাছেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ম্যাগ্নোলিয়া এবং কোথাও বা রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে মর্তের সামনে স্বর্গের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু এমন মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতন চোখ ও সময় কুমারের তখন ছিল না। এবং বাঘার লক্ষ্য এসব কোনওদিকেই নেই-তার চেষ্টা কেবল এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছেড়ে কুমার আবার উঠে পড়ে অগ্রসর হল।

ঘণ্টাখানেক পথ চলবার পরেই দেখা গেল, পথের সামনেই পাহাড়ের একটা উঁচু, খাড়া গা দাঁড়িয়ে আছে। কুমার ভাবতে লাগল, তাহলে এ-পথটা কি ওইখানেই গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু ওখানে তো আর কোনও কিছুরই চিহ্ন নেই। তবে কি আমি ভুল পথে এসেছি,এত পরিশ্রম একেবারেই ব্যর্থ হবে?

সেই খাড়া পাহাড়ের কাছে এসে কুমার দেখলে, না, পথ শেষ হয়নি-ওই খাড়া পাহাড়ের তলায় এক গুহা,-পথটা তার ভিতরেই ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

তবে কি ওই গুহাটাই হচ্ছে সেই রাক্ষুসে জীবদের আস্তানা?

বাহির থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কুমার গুহার ভিতরে কিছুই দেখতে পেলে না-তার ভিতরে স্তম্ভিত হয়ে বিরাজ করছে কেবল ছিদ্রহীন অন্ধকার ও ভীষণ স্তব্ধতা!

টর্চের আলো ফেলেও বোঝা গেল না, গুহাটা কত বড় এবং তার ভিতরে কী আছে।

বাঘা সেই গুহার ভিতরে ঢুকবার জন্যে বিষম গোলমাল করতে লাগল।

বাঘার রকম দেখে কুমারেরও বুঝতে বাকি রইল না যে, শত্রুরা ওই গুহার ভিতরেই আছে।

এখন কী করা উচিত? গুহার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও লাভ নেই এবং গুহার ভিতরে ঢুকলেও হয়তো কোনও সুবিধাই হবে না–শত্রুরা হয়তো তার জন্যেই আনাচে কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে আছে, একবার সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেই পোকা-মাকড়ের মতন তাকে টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

কুমার বাঁ-হাতে বাঘার শিকল নিলে। রিভলভারটা খাপ থেকে বার করে একবার পরীক্ষা করে দেখলে। তারপর ডানহাতে টর্চটা নিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে।

.

আট। গুহার ভিতরে

বাইরের প্রখর আলো ছেড়ে গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই চতুর্দিকব্যাপী প্রচণ্ড ও বিপুল এক অন্ধকারে কুমার প্রথমটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার টর্চের আলো-বাণে বিদ্ধ হয়ে অন্ধকারের অদৃশ্য আত্মা যেন নীরবে আর্তনাদ করে উঠল। সেখানকার অন্ধকার হয়তো জীবনে এই প্রথম আলোকের মুখ দেখলে!

টর্চের আলোক-শিখা ক্রমেই কম-উজ্জ্বল হয়ে দূরে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। কুমার বুঝলে, এ-বড় যে-সে গুহা নয়। টর্চে-র মুখ ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়েও আলো ফেলে সে পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কোনওদিকেই অন্ধকারের থই পাওয়া গেল না।

এত বড় গুহা ও এত জমাট অন্ধকারে ভিতরে কোনওদিকে যে যাওয়া উচিত, সেটা আন্দাজ করতে না পেরে কুমার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু বাঘার ঘ্রাণ শক্তি তাকে বলে দিলে, শত্রুরা কোনদিকে গেছে! শিকলে টান মেরে সে আবার একদিকে অগ্রসর হতে চাইলে। অগত্যা কুমারকেও আবার বাঘার উপরেই নির্ভর করতে হল।

কিন্তু আগেকার মতো বাঘা এখন আর দ্রুতবেগে অগ্রসর হল না। সে কয়েকপদ এগিয়ে যায়, আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শোনে এবং গরর গরর করে গজরাতে থাকে। যেন সে শত্রুর খোঁজ পেয়েছে।

কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকারের রাজ্যে শত্রুরা যে কোথায় লুকিয়ে আছে, অনেক চেষ্টার পরেও কুমার তা আবিষ্কার করতে পারলে না।

অদ্ভুত সেই অন্ধকার গুহার স্তব্ধতা! বাদুড়ের মতন অন্ধকারের জীবের পাখনাও সেখানে ঝটপট করছে না,–স্থির স্তব্ধতার মধ্যে নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে এবং নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই গায়ে কাঁটা দেয়!

কিন্তু বাঘার হাবভাবের অর্থ কুমার ভালোরকমই জানে। যদিও শত্রুর কোনও চিহ্নই তার নজরে ঠেকল না, তবু এটুকু সে বেশ বুঝতে পারলে যে, বাঘা যখন এমন ছটফট করছে। তখন শত্রুরা আর বেশি দূরে নেই; হয়তো কোনও আনাচে কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে তারা তার প্রত্যেক গতিবিধিই লক্ষ করছে। কিন্তু একটা বিষয় কুমারের কাছে অত্যন্ত রহস্যের মতো মনে হল। অনেকের মুখেই শত্রুদের যে দানব-মূর্তির বর্ণনা সে শ্রবণ করেছে, এবং তাদের একজনের যে অমানুষিক হাত সে স্বচক্ষে দর্শন করেছে, তাতে তো তাদের কাছে তার ক্ষুদ্র দেহকে নগণ্য বলেই মনে হয়। তার উপরে এই অজানা শত্রুপুরীতে সে এখন একা এবং একান্ত অসহায়। যখন তারা দলে ভারী ছিল, শত্রুরা তখনই বিনয়বাবু, রামহরি ও বিমলকে অনায়াসেই হরণ করেছে। এবং এত বড় তাদের বুকের পাটা যে, আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র দার্জিলিঙে গিয়ে হানা দিতেও তারা ভয় পায় না। কিন্তু তারা এখনও কেন লুকিয়ে আছে,–কেন তাকে আক্রমণ করছে না? এর কারণ কি? কীসের ভয়ে তারা সুমুখে আসতে রাজি নয়?

এমনি ভাবতে ভাবতে কুমার প্রায় আধ মাইল পথ এগিয়ে গেল। তখনও গুহা শেষ হল না।

এখনও বাঘা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা গর্জন করছে বটে, কিন্তু এখন তার ভাব-ভঙ্গিতে কুমার একটা নতুনত্ব লক্ষ করলে।

বাঘা তখন আর ডাইনে-বাঁয়ে বা সামনের দিকে তাকাচ্ছে না-বারবার দাঁড়িয়ে সে। পিছনপানে ফিরে দেখছে আর গর্জন করে উঠছে! যেন শত্রু আছে পিছনদিকেই। এ সময়ে কুমারের মনের ভিতরটা যে কীরকম করছিল, তা আর বলবার নয়।

আর-একটা ব্যাপার তার নজরে পড়ল! টর্চের আলোতে সে দেখতে পেলে, তার ডাইনে আর বাঁয়ে গুহার কালো পাথুরে গা দেখা যাচ্ছে। তাহলে গুহাটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে!

আরও খানিকটা এগুবার পর গুহার দুদিকের দেওয়াল তার আরও কাছে এগিয়ে এল। এখন সে যেন একটা হাত-পনেরো চওড়া পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

আরও কিছুপরেই মনে হল, সামনের দিকের অন্ধকার যেন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কয়েক পা এগিয়ে আলো ফেলে দেখা গেল, গুহাপথ সেখানে ডানদিকে মোড় ফিরেছে।

মোড় ফিরেই কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, গুহার পথ আবার ক্রমেই চওড়া এবং ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়ে আর একটা বিরাট গুহার সৃষ্টি করেছে!

এ গুহা অন্ধকার নয়, আলো-আঁধারিতে এখানকার খানিকটা দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা দেখা যাচ্ছে না! সন্ধ্যার কিছু আগে পৃথিবী যেমন আলোছায়ার মায়াভরা হয়, এই নতুন গুহার ভিতরে ঠিক তেমনিধারাই আলো আর ছায়ার লীলা দেখা যাচ্ছে!

এই আলো-আঁধারির পরে একদিকে ঠিক আগেকার মতোই নিরেট অন্ধকার বিরাজ করছে। এবং আর একদিকে-অনেক তফাতে উপর থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকের ঝরনা

ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ এখানে একদিক থেকে আসছে অন্ধকারের স্রোত এবং আর একদিক থেকে আসছে। আলোকের ধারা,–এই দুইয়ে মিলেই এখানকার বিচিত্র আলোছায়ার সৃষ্টি হয়েছে!

আচম্বিতে এই নতুন গুহার ভিতরে দূরে থেকে নিবিড় অন্ধকারের দিক থেকে জেগে উঠল মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ। অত্যন্ত যন্ত্রণায় কে যেন তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠল। তারপরেই সব চুপচাপ!

কার এ কান্না? নিশ্চয় বিমলের নয়, কারণ মৃত্যুর মুখে পড়লেও বিমল যে কোনওদিনই কাতরভাবে কাঁদবে না, কুমার তা জানত। মঙ্গলগ্রহে ও ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে বিনয়বাবুর সাহসও সে দেখেছে, তিনিও এমন শিশুর মতন কাঁদবেন বলে মনে হয় না। তবে কি রামহরি বেচারিই এমনভাবে কেঁদে উঠল? অসম্ভব নয়। তার বুকের পাটা থাকলেও ভূতের ভয়ে সে সব করতে পারে! হয়তো কল্পনায় ভূত দেখে সে ককিয়ে উঠেছে!...না, কল্পনাই বা বলি কেন, আজ সকালেই আমার চোখের উপরে যে-হাতের বাঁধনে বিমল বন্দি হয়েছে, সে কি মানুষের হাত?

কিন্তু এ আর্তনাদ যারই হোক, তার উৎপত্তি কোথায় এবং কোনদিকে? ভালো করে বোঝবার আগেই সেই আর্তনাদ থেমে গেল–কেবল গুহার বিরাট গর্তের মধ্যে সেই একই কণ্ঠের আর্তনাদ প্রতিধ্বনির মহিমায় বহুজনের কান্নার মতন চারিদিক অল্পক্ষণ তোলপাড় করে আবার নীরব হল। গুহার মধ্যে আবার অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা–নিজের হৃৎপিণ্ডের দুপদুপুনি নিজের কানেই শোনা যায়।

.

কুমার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে যদি আবার সেই কান্না শোনা যায়! কিন্তু কান্না আর শোনা গেল না।

তখন কুমার বাঘাকে ডেকে শুধোলে, হ্যাঁ রে বাঘা, এবারে কোনদিকে যাব বল দেখি!

বাঘা যেন মনিবের কথা বুঝতে পারলে। সে একবার ল্যাজ নাড়লে। একবার পিছনপানে চেয়ে গরর-গরর করলে, তারপর ফিরে পাহাড়ের ঢালু গা বয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

বাঘার অনুসরণ করতে করতে কুমার নিজের মনে-মনেই বলতে লাগল, বাঘার বারবার পিছনে ফিরে তাকানোটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। শত্রুরা নিশ্চয়ই আমার পালাবার পথ বন্ধ করেছে। এখন সামনের দিকে এগুনো ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। প্রাণ। নিয়ে ফেরবার কোনও আশাই দেখছি না,–এখন মরবার আগে একবার খালি বিমলের মুখ দেখতে চাই।

..গুহার মেঝে আর ঢালু নেই, সমতল। কুমার আলোকের সেই ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল। চারিদিকে আগে অন্ধকারের বেড়াজাল তারপর আবছায়ার মায়া এবং তারই মাঝখানে সেই আলো-নিঝর ঝরে পড়ছে, যেন দয়ালু আকাশের আশীর্বাদ! কী মিষ্টি সে আলো! কুমার আন্দাজে বুঝলে, গুহার ছাদে নিশ্চয় কোথাও একটা বড় ফাঁক আছে!

হঠাৎ অনেকদূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ জেগে উঠল!

কুমার চমকে উঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘাও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

শব্দটা প্রথমে অস্পষ্ট ছিল, তারপরে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারপর শব্দ যখন আরও কাছে এসে পড়ল, কুমারের গা তখন শিউরে উঠল।

এ শব্দ যেন তার পরিচিত। কাল রাত্রেই সে যে এই শব্দ শুনেছে! এ যেন স্টিমার কু দিচ্ছে। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো–যেন শত শত স্টিমার একসঙ্গে কু দিতে-দিতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই উদ্ভট ও বীভৎস ঐকতান ক্রমেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে সমস্ত গুহাকে পরিপূর্ণ করে ফেললে এবং তার সঙ্গে যোগ দিলে চারিদিক থেকে অসংখ্য প্রতিধ্বনি। সেই শান্ত ও স্তব্ধ গুহা দেখতে-দেখতে যেন এক শব্দময় নরক হয়ে উঠল।

বাঘাও পাল্লা দিয়ে চাঁচাতে শুরু করলে কিন্তু অনেকগুলো তোপের কাছে সে যেন একটা ধানি পটকার আওয়াজ মাত্র!

এই ভয়াবহ গোলমালের হেতু বুঝতে না পেরে কুমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল, খানিকক্ষণ।

.

কিন্তু গোলমালটা ক্রমেই তার কাছে এসে পড়ল। আবছায়ার ভিতরে জেগে উঠল দলে দলে কতকগুলো সৃষ্টি ছাড়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি...এতদূর থেকে তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অমানুষি দেহের বিশালতা যে বিস্ময়কর, এটুকু অনায়াসেই আন্দাজ করা যায়।

কুমার তাড়াতাড়ি বাঘাকে টেনে নিয়ে যে-পথে এসেছিল সেইদিকে ফিরতে গেল- কিন্তু ফিরেই দেখলে তার পালাবার পথ জুড়ে খানিক তফাতে তেমনি বীভৎস এবং তেমনি ভয়ংকর অনেকগুলো অসুরের মূর্তি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, দুঃস্বপ্নের মতো।

সে ফিরে আর একদিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না, সেদিকেও অন্ধকারের ভিতর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আরও কতকগুলো মূর্তিমান বিভীষিকা! প্রত্যেক মূর্তিই মাথায় হাতির মতন উঁচু!

এতক্ষণ সকলে আঁধারে গা ঢেকে ওত পেতে ছিল, এইবারে সময় বুঝে চতুর্দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে তারা কুমারকে একেবারে ঘিরে ফেললে!

বাঘাও আর চাঁচালে না, সেও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

গুহার অন্ধকার এখন কুমারের চোখের ভিতরে এসে তার দৃষ্টিকেও অন্ধকার করে দিলে।

.

নয়। অন্ধকারের গর্তে

কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! মাথায় হাতির সমান উঁচু, দেখতে মানুষের মতন, কিন্তু কী বিভীষণ আকৃতি! তাদের সর্বাঙ্গে গরিলার মতন কালো কালো লোম এবং তাদের ভঁটার মতন চোখগুলো দিয়ে হিংস্র ও তীব্র দৃষ্টি বেরিয়ে এসে কুমারের স্তম্ভিত মনকে যেন দংশন করতে লাগল।

সেই অমানুষিক মানুষদের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীলোকও আছে, কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ!

কুমার লক্ষ্য করে দেখলে, দূর থেকে সার বেঁধে অসংখ্য মূর্তি দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে ঠিক যেন মিছিলের মতো। সেই বীভৎস মূর্তিগুলোই হাত তুলে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করছে। আর মনে হচ্ছে, যেন অনেকগুলো স্টিমার একসঙ্গে কু দিচ্ছে!...কোন জীবের কণ্ঠ থেকে যে অমন তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ আওয়াজ বেরুতে পারে সেটা ধারণা করাই অসম্ভব!

কিন্তু কীসের ওই মিছিল? প্রথমটা কুমার ভাবলে, হয়তো ওরা তাকেই আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু তারা যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, তখন বেশ বোঝা গেল, ও-দলের কারুর দৃষ্টি কুমারের দিকে নেই। নিজেদের খেয়ালে তারা নিজেরাই মত্ত হয়ে আছে।

চারিদিকের অন্ধকারের ভিতর থেকে এতক্ষণে আরও যে-সব অপরূপ মূর্তি একে একে বেরিয়ে আসছিল, তারাও এখন যেন কুমারের অস্তিত্বের কথা একেবারেই ভুলে গেল,- অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে সেই মিছিলের দিকে তাকিয়ে তারাও সবাই হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাফাতে তেমনি বিকট স্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে! এ কী ব্যাপার? কেন এত লম্ফ-ঝম্প, আর কেনই বা এত হট্টগোল?

কুমার কিছুই বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু আর একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করলে। সেই বিরাট মিছিলের আগে আগে মিশমিশে কালো কি একটা জীব আসছে! কী জীব ওটা? কুকুর বলেই তো মনে হয়!

কুমারের দৃষ্টি যখন মিছিল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে, তখন হঠাৎ একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। এখানকার এই অদ্ভুত মানুষগুলোকে দেখে বাঘা এতক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু নিজেদের জাতের নতুন একটি নমুনা দেখে তার সে-ভাব আর রইল না,–আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে শিকলসুদ্ধ কুমারের হাত ছাড়িয়ে সে সেই মিছিলের কুকুরটার দিকে ছুটে গেল, তিরের মতন বেগে!

এর জন্যে কুমার মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বাঘাকে সে নিবারণ করতেও পারলে না।

তারপর কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না কারণ সেই দানবমানুষগুলো চারিদিক থেকে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বাঘাকে একেবারে তার চোখের আড়াল করে দিলে!

কুমার বুঝলে, বাঘার আর কোনও আশাই নেই, এই ভয়াবহ জীবগুলোর কবল থেকে বাঘাকে সে আর কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না!

হঠাৎ আর একদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একটা ভীষণ দানবমূর্তি তার দিকেই বেগে এগিয়ে আসছে। কুমার সাবধান হওয়ার আগেই সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল এবং তাকে ধরবার জন্যে কুলোর মতন চ্যাটালো একখানা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।...কুমার টপ করে মাটির উপর বসে পড়ল এবং সেই অসম্ভব হাতের বাঁধনে ধরা পড়বার আগেই নিজের কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে তিন-চারবার গুলিবৃষ্টি করলে। গুলি খেয়ে দানবটা ভীষণ আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল এবং সেই ফাঁকে কুমার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে প্রাণপণে দৌড়োতে লাগল।

দৌড়োতে-দৌড়োতে কুমার আবার নিবিড় অন্ধকারের ভিতর এসে পড়ল। দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে সে তা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু তার পিছনে পিছনে মাটির উপরে ভারী ভারী পা ফেলে সেই আহত ও ক্রুদ্ধ দানবটা যে ধেয়ে আসছে এটা তার আর জানতে বাকি রইল না।

আচম্বিতে কুমারের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল, দুই হাতে অন্ধকার শূন্যকে আঁকড়ে ধরার জন্যে সে একবার বিফল চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তে কঠিন পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেললে!

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান হল সে তা জানে না। কিন্তু চোখ খুলে সে আবার দেখলে তেমনি ছিদ্রহীন অন্ধকারেই চারিদিক আবার সমাধির মতোই স্তব্ধ, দানবের কোনও সাড়াই আর কানে আসে না। এদিকে-ওদিকে হাত বুলিয়ে অনুভবে বুঝলে, সে পাহাড়ের গায়েই শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল। দু-চারবার হাত-পা নেড়ে-চেড়ে দেখলে তার দেহের কোনও জায়গা ভেঙে গেছে কিনা!

হঠাৎ সে চমকে উঠল! অন্ধকারে পায়ের শব্দ হচ্ছে।

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠেই শুনলে–কুমার, তোমার কি বেশি চোট লেগেছে?

এ যে বিনয়বাবুর গলা!

বিপুল বিস্ময়ে কুমার বলে উঠল, বিনয়বাবু! আপনি?

হা কুমার, আমি।

আমিও এখানে আছি কুমার!

অ্যাঁ! বিমল! তুমি তাহলে বেঁচে আছ!

হ্যাঁ ভাই, আমি বেঁচে আছি, রামহরিও বেঁচে আছে, আরও অনেকেও বেঁচে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন কারুকেই বাঁচতে হবে না। দিনে দিনে আমাদের দল থেকে ক্রমেই লোক কমে যাচ্ছে। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে-দেখতে আমরা বেঁচে আছি!

কি বলছ বিমল, তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

একে একে সব কথাই শুনতে পাবে। আগে তোমার কথাই বলো।

.

দশ। অন্ধকারের বুকে আলোর শিশু

কুমার নিজের সব কথা বিমলের কাছে বলে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তোমরা সবাই কেমন করে এখানে এসে মিললে?

বিমল বললে, আমাদের ইচ্ছায় এ মিলন হয়নি। এ মিলন ঘটিয়েছে শত্রুরাই।

বিমল, তোমার কথা আমার কাছে হেঁয়ালির মতন লাগছে। আমাকে সব বুঝিয়ে দাও।

এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই কুমার। কাদের হাতে আমরা বন্দি হয়েছি, তা তুমি জানো। কখন আমরা বন্দি হয়েছি, তাও তুমি জানো। এখন আমরা কোথায় আছি তাও তোমার অজানা নয়।

না বিমল, এখন আমরা কোথায় আছি, তা আমার জানা নেই, চারিদিকে যে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার।

বিমল বললে, এটা একটি মস্ত বড় লম্বা-চওড়া গর্ত।

বিনয়বাবু বললেন, আর, এই গর্তটা হচ্ছে আমাদের শত্রুদের বন্দিশালা।

বন্দিশালা?

হ্যাঁ। শত্রুরা আমাদের এখানে বন্দি করে রেখেছে। তুমি যেচে এই কারাগারে এসে ঢুকেছ। এর চারিদিকে খাড়া পাথরের উঁচু দেওয়াল। এখান থেকে পালাবার কোনও উপায়ই নেই।

একটু তফাত থেকে রামহরির কাতরকণ্ঠ শোনা গেল–ভূতের জেলখানা! বাবা মহাদেব। রোজ তোমার পূজো করি, এই কি তোমার মনে ছিল বাবা?

কুমার বললে, তাহলে শত্রুরা তোমাদের সকলকে একে একে ধরে এনে এইখানে বন্ধ করে রেখেছে?

বিমল বললে, হ্যাঁ। খালি আমরা নই, আমাদের সঙ্গে এই গর্তের মধ্যে আরও অনেক পাহাড়ি লোকও বন্দি হয়ে আছে। দার্জিলিং আর হিমালয়ের নানান জায়গা থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে।

এর মধ্যে মৃণু নেই?

না। মৃণু কেন, এই গর্তের ভেতরে কোনও মেয়েই নেই! তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দিশালা আছে কিনা জানি না।

এ যে এক অদ্ভুত রহস্য! আমাদের বন্দি করে রাখলে এদের কি উপকার হবে?

তা জানি না। কিন্তু বন্দি পাহাড়িদের মুখে শুনলুম, প্রতি হপ্তায় একজন করে বন্দিকে ওরা গর্ত থেকে বার করে নিয়ে যায়। যে বাইরে যায়, সে নাকি আর ফেরে না।...কুমার এই ব্যাপার থেকে তুমি অনেক কিছুই অনুমান করতে পারো।

কুমার শিউরে উঠে বললে, কী ভয়ানক! ওরা কি তবে প্রতি হপ্তায় একজন করে মানুষকে হত্যা করে?

আমার তো তাই বিশ্বাস। হঠাৎ একদিন তোমার কি আমার পালা আসবে। এস, সেজন্যে আমরা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকি।

সে কী বিমল, আমরা কি কোনওই বাধা দিতে পারি না?

না। সিংহের সামনে ভেড়া যেমন অসহায়, ওদের সামনে আমরাও তেমনি। ওদের চেহারা তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি। ওদের একটা কড়ে আঙুলের আঘাতেই আমাদের দফা রফা হয়ে যেতে পারে। বাধা দিয়ে লাভ?

কুমার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, ওরা কে বিমল? রূপকথায় আর আরব্য-উপন্যাসে দৈত্য-দানবের কথা পড়েছি। কিন্তু তারা কি সত্যই পৃথিবীর বাসিন্দা?

কুমারের আরও কাছে সরে এসে বিমল বললে, কুমার, তাহলে শোনো। আরব্য-উপন্যাসে দৈত্য-দানবরা সত্যি কি মিথ্যে, তা আমি বলতে পারব না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এক সময়ে যে দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড মানুষ ছিল, একথা আমি মনে-মনে বিশ্বাস করি। মাঝে মাঝে সে প্রমাণও পাওয়া যায়। তুমি কি জানো না, এই ভারতবর্ষেই কাটনির কাছে একটি ৩১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা বিরাট কঙ্কাল পাওয়া গেছে? তার পা দুটোই ১০ ফুট করে লম্বা। সে কঙ্কালটা প্রায় মানুষের কঙ্কালের মতোই দেখতে। রামগড়ের রাজার প্রাসাদে কঙ্কালটা রাখা হয়েছে। আমি স্টেটসম্যানে এই খবরটা পড়েছি।

বিনয়বাবু বললেন, দেখো, দার্জিলিংয়ের সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে যেদিন ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের পুরোনো ফাইলে হিমালয়ের রহস্যময় জীবের কথা পড়লুম, সেইদিন থেকে অনেক কথাই আমার মনে হচ্ছে। এর আগেও কোনও কোনও ভ্রমণ কাহিনিতে আমি হিমালয়ের ঘৃণ্য তুষার-মানবের কথা পড়েছি। ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে হয়তো তাদেরই কথা বেরিয়েছে। কিন্তু আসলে কে তারা? তারা কি সত্যিই মানুষ, না মানুষের মতন দেখতে অন্য কোনও জীব? আধুনিক পণ্ডিতদের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিতরে খুঁজলে হয়তো এ-প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে।

কুমার সুধোলে, আমাদের চেয়ে আপনার পড়াশুনো ঢের বেশি। আপনি কোনও সদুত্তর পেয়েছেন কি?

বিনয়বাবু বললেন, সে-বিষয়ে আমি নিজে জোর করে কিছু বলতে চাই না। তবে পণ্ডিতদের আবিষ্কারের কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে পারি, শোনো।

পণ্ডিতদের মতে, এখন যেখানে হিমালয় পর্বত আছে, অনেক লক্ষ বৎসর আগে মহাসাগরের অগাধ জল সেখানে খেলা করত। কারণ আধুনিক হিমালয়ের উপরে অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের শিলাভূত কঙ্কাল বা দেহাবশেষ অর্থাৎ fassil পাওয়া গিয়েছে।

হিমালয়ের আশেপাশে যেসব দেশ আছে, এখনও ধীরে-ধীরে তারা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। হিসাব করে দেখা গেছে, কাশীধামের উত্তরদিকে ভূমি এখনও প্রতি শতাব্দীতেও ৬ ফুট করে উঁচু হয়ে উঠছে।

হিমালয়ের ঊর্ধ্ব ভাগ থেকে রাশি রাশি পচা গাছপাতা ও অন্যান্য আজেবাজে জিনিস পাহাড়ের দুইপাশে নেমে এসে জমা হয়ে থাকত। কালে সেইসব জায়গা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (mammals) বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এখানে তাই আজও এত আদিম জীব-জন্তুর শিলীভূত কঙ্কাল পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতেরা এ-জায়গাটাকে সেকেলে জীবদের গোরস্থান বলে ডেকে থাকেন।

কিছুদিন আগে Yale North India Expedition-এর পণ্ডিতরা উত্তর-ভারত থেকে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানুষের মতন দেখতে এক নতুন জাতের বানরের অস্তিত্ব!

ওই অভিযানে দলপতি ছিলেন অধ্যাপক Hellmut de Terra সাহেব। উত্তর-ভারতবর্ষে এক বৎসর কাল তিনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেছেন। তার পরীক্ষার ফলে যে-সব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কোনও-কোনওটিকে দেখতে প্রায় মানুষের মতন। অন্তত গরিলা ওরাং ওটাং বা শিম্পাঞ্জি বানরদের সঙ্গে তাদের দেহের গড়ন মেলে না। এইরকম দুই জাতের অজানা জীবের নাম দেওয়া হয়েছে Ramapitheeus ও Sugrivapitheeus। নাম শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নামানুসারেই তাদের নামকরণ হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতে, উত্তর-ভারতে প্রাপ্ত এইসব জীবের কোনও-কোনওটির মস্তিষ্ক, গরিলা প্রভৃতি সমস্ত মানব জাতীয় জীবের মস্তিষ্কের চেয়ে উন্নত। তাদের মস্তিষ্কের শক্তি ছিল অনেকটা মানুষেরই কাছাকাছি।

কে বলতে পারে, ওইসব জীবের কোনও কোনও জাতি এখনও হিমালয়ের কোনও গোপন প্রান্তে বিদ্যমান নেই? তারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়নি বলে আধুনিক মানুষ তাদের খবর রাখে না। কিন্তু আমরা জানি না বলেই যে তারা বেঁচে নেই, এমন কথা কিছুতেই মনে করা চলে না। হয়তো তারা বেঁচে আছে এবং হয়তো তারা সভ্য না হলেও মস্তিষ্কের শক্তিতে আগেকার চেয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে।

বিমল, কুমার! আর যা জানি আর মনে করি, সব তোমাদের কাছে খুলে বললুম। তবে আমার অনুমানই সত্য বলে তোমরা গ্রহণ না করতেও পারো।

বিমল বললে, তাহলে আপনার মত হচ্ছে, মানুষের মতন দেখতে বানর-জাতীয় দানবরাই আমাদের সকলকে বন্দি করে রেখেছে?

বিনয়বাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, বললুম তো, ওটা আমার মত না, আমার অনুমান মাত্র।

কুমার বাহুকেই বালিশে পরিণত করে কঠিন পাথরের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে।

বিমল প্রভৃতির মুখেও কোনও কথা নেই! চারিদিক যেমন স্তব্ধ, তেমনি অন্ধকার।

হঠাৎ কুমারের মনে হল, অন্ধকারের বুক ছাদা করে যেন ছোট্ট একটি আলো-শিশু কাঁপতে কাঁপতে হেসে উঠল।

প্রথমটা কুমার ভাবলে, তার চোখের ভুল। কিন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভালো করে চেয়ে সে বুঝলে, সে আলো একটা মশালের আলো! গর্তের উঁচু পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে কেউ

মশাল হাতে নিয়ে কি দেখছে! মশালের তলায় একখানা অস্পষ্ট মুখও দেখা গেল কুমারের মনে হল সে মুখ যেন তারই মতন সাধারণ মানুষের মুখ!

কে যেন উপর থেকে চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় ডাকলে, কুমারবাবু! কুমারবাবু!

এ যে নারীর কণ্ঠস্বর। নিজের কানের উপরে কুমারের অবিশ্বাস হল–এই রাক্ষসের মুল্লুকে মানুষের মেয়ে।

.

এগারো । কুকুর-দেবতার মুল্লুক

কেবল কি মানুষের মেয়ে? এ মেয়ে যে তারই নাম ধরে ডাকছে।

কুমার ভাবলে, হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

আবার উপর থেকে চাপা গলার আওয়াজ এল–কুমারবাবু!

এবারে কুমার আর চুপ করে থাকতে পারলে না, চাপা গলায় উত্তর দিলে, কে?

উপর থেকে সাড়া এল, ঠিক আমার নীচে এসে দাঁড়ান।

কুমার কথামতো কাজ করলে।

এইটে নিন!

কুমারের ঠিক পাশেই খট করে কি একটা শব্দ হল। গর্তের তলায় হাত বুলিয়ে কুমার জিনিসটা তুলে দিলে। অন্ধকারেই অনুভবে বুঝলে, একখণ্ড পাথরের সঙ্গে সংলগ্ন কয়েক টুকরো কাগজ। উপরে মুখ তুলে দেখলে, সেখানে আর মশালের আলো নেই। ...আস্তে আস্তে ডাকল, বিমল!

বিমল বললে, হ্যাঁ, আমরাও সব দেখেছি, সব শুনেছি।

বিনয়বাবু বললেন, কুমার, তুমি মৃণুকে চিনতে পারলে না?

কুমার সবিস্ময়ে বললে, মৃণু! যে আমাকে ডাকলে, সে কি মৃণু? আপনি চিনতে পেরেছেন?

বাপের চোখ নিজের সন্তানকে চিনতে পারবে না?

কিন্তু কি আশ্চর্য! যার খোঁজে এতদুর আসা, তাকে পেয়েও আপনি তার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনয়বাবু বললেন, কত কষ্টে যে নিজেকে সামলেছি, তা কেবল আমিই জানি কুমার! কিন্তু কী করব বলো? যখন দেখলুম এই শত্রুপুরীতে আমার মেয়ের ভয়ে ভয়ে চাপা-গলায় তোমাকেই ডাকছে, তখন নিজের মনের আবেগ জোর করে দমন না করলে মৃণুকে হয়তো বিপদে ফেলা হত!

বিমল বললে, দেখুন বিনয়বাবু, আমার বিশ্বাস আপনি আর আমি যে আছি, মৃণু তা জানে না। খুব সম্ভব, কেবল কুমারকেই সে দেখতে পেয়েছে, তাই তাকে ছাড়া আর কারুকে ডাকেনি।

বিনয়বাবু বললেন, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।

কুমার বললে, মৃণু কতকগুলো টুকরো কাগজ দিয়ে গেল, নিশ্চয় তাতে কিছু লেখা আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে কেমন করে পড়ব? আমার টর্চ গর্তে পড়বার সময় ভেঙে গেছে।

বিনয়বাবু বললেন, কাল আমি দেখেছি, পাহাড়ের এক ফাটল দিয়ে কোনও এক সময়ে এই গর্তের ভিতরে সূর্যরশ্মির একটা রেখা কিছুক্ষণের জন্যে এসে পড়ে। আজও নিশ্চয় সেই আলোটুকু পাওয়া যাবে। অপেক্ষা করো।

উপর থেকে সূর্যের একটি কিরণ-তির নিবিড় অন্ধকারের বুক বিদ্ধ করে গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে এসে পড়ল।

বিনয়বাবু বললেন, কুমার, চটপট কাজ সেরে নাও! এ আলো এখনি পালাবে।

সূর্যরশ্মির সামনে কাগজের টুকরোগুলো ধরে কুমার দেখলে, একখানা ছোট ডায়েরি থেকে সেগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। বোধহয় দানবদের হাতে ধরা পড়বার সময়েই ডায়েরিখানা মৃণুর কাছে ছিল।

ডায়েরির ছেঁড়া কাগজে পেনসিল লেখা রয়েছে–

কুমারবাবু, কী করে ধরা পড়েছি, সেকথা যদি দিন পাই, তবে বলব। কারণ আমার স্থান ও সময় দুই-ই অল্প।

তবে আপনিও যখন এদের হাতে ধরা পড়েছেন, তখন এরা যে কে ও কি-প্রকৃতির জীব, সেটা বোধহয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন।

যাদের কাছে আমি আছি, তারা মানুষ কিনা, আমি জানি না। তবে তাদের মুখ আর দেহ মানুষের মতন দেখতে বটে। এরা পরস্পরের সঙ্গে যখন কথা কয়, তখন এদের ভাষাও আছে। কিন্তু এদের ভাষায় কথার সংখ্যা খুবই কম।

কেবল ভাষা নয়, এদের একটা ধর্মও আছে। সে ধর্মের বিশেষ কিছুই আমি জানি না বটে, কিন্তু এরা যে সেই ধর্মের বিধি পালন করবার জন্যেই নানা জায়গা থেকে মানুষ ধরে আনে, এটুকু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি!

কুমারবাবু, আপনি শুনলে অবাক হবেন, এদের প্রধান দেবতা হচ্ছে কুকুর! আর আমি কে জানেন? কুকুর-দেবতার প্রধান পূজারিনি। আমার এখানে আদর যত্নের অভাব নেই, সবাই আমাকে ভয়-ভক্তিও করে বোধহয়, কিন্তু এরা সর্বদাই আমাকে চোখে-চোখে রাখে, পাছে আমি পালিয়ে যাই, সেজন্যে চারিদিকেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে।

আমার থাকবার জন্যে এরা একটা আলাদা গুহারও ব্যবস্থা করেছে। সে গুহার ভিতরকার কোনও কোনও আসবাব ও জামাকাপড় আর আগেও দেওয়ালে আজেবাজে জিনিস দিয়ে আঁকা ছবি দেখে মনে হয়, আমার আগেও এখানে অন্য পূজারিণী ছিল এবং সেও আমারই মতন মানুষের মেয়ে।

বোধহয় এদের দেশে মানুষের মেয়ে ছাড়া আর কেউ পূজারিনি হতে পারে না। একজন পূজারিনির মৃত্যু হলে মানুষের দেশ থেকে আবার একজন মেয়েকে বন্দি করে আনা হয়।

প্রতি হপ্তায় একদিন করে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী। সে নদী অত্যন্ত গভীর। এদেশের কেউ সাঁতার জানে না বলে সে-নদীতে ভয়ে কেউ নামে না। এদের ইঙ্গিতে যতটুকু বুঝেছি, সে নদীর নাকি আদিঅন্ত নেই। প্রতি হপ্তায় বিশেষ পূজার দিনে, কুকুর-দেবতাকে দিয়ে আমাকে সেই নদীর ধারে যেতে হয়, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে আগে পিছে চলে দলে দলে এখানকার যত না-রাক্ষস, না-মানুষ, -বানর জীব নাচতে-নাচতে আর চাচাতে-চাঁচাতে। নদীর জলে কুকুর-দেবতাকে স্নান করিয়ে আবার ফিরে আসি এবং তারপর যা হয়,–উঃ, সে কথা আর বলবার নয়।

কুমারবাবু, এরা মানুষ চুরি করে আনে কেন, তা জানেন? কুকুর-দেবতার সামনে নরবলি দেওয়ার জন্যে! বলির পরে সেই মানুষের মাংস এরা সবাই ভক্ষণ করে। চোখের সামনে এই ভীষণ দৃশ্য দেখে আমার যে কি অবস্থা হয়, সেটা আপনি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারবেন।

এমনি এক বিশেষ পূজার দিনে নদীর ধার থেকে ফিরে আসছি, আচম্বিতে কোথা থেকে মস্ত বড় একটা কুকুর এসে এখানকার কুকুর-দেবতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তারপর দুই কুকুরে বিষম ঝটাপটি লেগে গেল। এখানকার কুকুরটা দেবতা হয়েও জিততে পারলে না, নতুন কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত দেহেই কেউ কেউ করে কাঁদতে কাঁদতে ল্যাজ গুটিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। নতুন কুকুরটা আমার কাছে এসে মনের

খুশিতে ল্যাজ নাড়তে লাগল। তখন একটু আশ্চর্য হয়ে তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখি, সে হচ্ছে আমাদেরই বাঘা।

বাঘা এখানে কেমন করে এল, অবাক হয়ে এই কথা ভাবতে-ভাবতে চোখ তুলেই আপনাকে দেখতে পেলুম। তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি লাগল না। আপনিও এদের কাছে বন্দি হয়েছেন।

বিজয়ী বাঘার বিক্রম দেখে এরা ভারী আনন্দিত হয়েছে। পরাজিত কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাঘাকেই এরা দেবতা বলে মেনে নিয়েছে। এবার থেকে আমাকে বাঘার পূজা করতে হবে।

কুমারবাবু, এখন আমাদের উপায় কী হবে? এই ভীষণ দেশ ছেড়ে আর কি আমরা স্বদেশে ফিরতে পারব না? আমাকে হারিয়ে না জানি আমার বাবার অবস্থা কি হয়েছে।

আজ বলির নরমাংস খেয়ে এরা সারারাত উৎসব করবে। কাল সকালে এরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়বে। যারা পাহারা দেবে তারাও বিশেষ সজাগ থাকবে না। সেই সময়ে আমি আবার চুপিচুপি আপনার গর্তের ধারে যাওয়ার চেষ্টা করব।

এখানে একরকম শক্ত লতা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে আমি একগাছা লম্বা ও মোটা দড়ি তৈরি করছি। গর্তের ভিতরে সেই দড়ি ঝুলিয়ে দিলে হয়তো আপনি উপরে উঠেও আসতে পারবেন।

আমাদের অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু কাল আমরা মুক্তিলাভের চেষ্টা করবই-তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।

আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

ইতি মৃণু।

.

বারো । অন্ধকূপের নদী

কুমারের পত্রপাঠ শেষ হল।

বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, এতদিন পরে আমার হারানো মেয়েকে পেয়ে মনে খুব আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু এ আনন্দের কোনও দাম নেই।

কুমার বললে, কেন বিনয়বাবু? মৃণু তো খুব সুখবরই দিয়েছে। কাল সকালে সে লতা দিয়ে দড়ি তৈরি করে আনবে বলেছে। আমাদের আর এই অন্ধকূপে পচে মরতে হবে না।

দুঃখের হাসি হেসে বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু দড়ি বেয়ে উপরে উঠলেও তো আমরা এই অন্ধকূপের গর্ভ থেকে বেরুতে পারব না। অন্ধের মতন এর ভেতরে এসে ঢুকেছি, কিন্তু বেরুবার পথ খুঁজে পাব কেমন করে?

কুমার খানিকক্ষণ ভেবে বললে, ভালোয় ভালোয় যদি বেরুতে না পারি, আমরা ওই দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

বিনয়বাবু বললেন, তাতে কোনওই লাভ হবে না। যুদ্ধে হেরে মরব আমরাই।

কুমার বললে, তাদের ভয় দেখিয়ে জিতে যেতেও পারি। আমাদের কাছে তিনটে বন্দুক আর তিনটে রিভলভার আছে। তাদের শক্তি বড় অল্প নয়।

রামহরি বললে, তোমরা একটা বন্দুক আমাকে দিও তো। অন্তত একটা ভূতকে বধ করে তবে আমি মরব।

বিনয়বাবু বললেন, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়! হ্যাঁ, ভালো কথা! এই গর্তে আরও অনেক মানুষ রয়েছে। এদের কি উপায় হবে!

কুমার বললে, কেন, ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। ওদের সঙ্গে নিলে আমাদের লোকবলও বাড়বে।

বিনয়বাবু বললেন, ছাই বাড়বে! দেখছ না, ভয়ে এরা একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে। কাপুরুষ কোনও কাজেই লাগে না।

কুমার বললে, বিমল, তুমি যে বড় কথা কইছ না?

বিমল বললে, আমি ভাবছি।

কী ভাবছ?

মৃণু চিঠিতে লিখেছে–আলো-ঝরনার ওপাশে আছে মস্ত এক নদী–আমি সেই নদীর কথাই ভাবছি।

এখন কি নদী-টদি নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত? আগে নিজের মাথা কী করে বাঁচবে সেই কথাই ভাবো।

কুমার, আমি মাথা বাঁচাবার কথাই ভাবছি। তোমার বন্দুক- টন্দুক বিশেষ কাজে লাগবে না, ওই নদীই আমাদের মাথা বাঁচাবে!

কুমার আশ্চর্য হয়ে বললে, কীরকম?

বিমল বললে, আমরা পাহাড়ের ওপরে আছি। এখানে যদি কোনও মস্ত নদী থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে, এই অন্ধকূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেছে। কেমন, তাই নয় কি?

হুঁ। তারপর?

মৃণু লিখেছে-এদেশের কেউ সাঁতার জানে না বলে সে নদীতে ভয়ে কেউ নামে না। এর চেয়ে ভালো খবর আর কি আছে?

কুমার হঠাৎ বিপুল আনন্দে একলাফ মেরে বলে উঠল, বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না! উঃ, আমি কি বোকা! এতক্ষণ এই সহজ কথাটাও আমার মাথায় ঢোকেনি!

বিমল বললে, এই গর্তের ওপরে উঠে কোনও গতিকে একবার যদি সেই নদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তাহলেই আমরা খালাস। দানবরা সাঁতার জানে না, কিন্তু আমরা সাঁতার জানি। নদীর স্রোতে ভেসে অন্ধকূপের বাইরে গিয়ে পড়ব।

বিনয়বাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, শাবাশ বিমল, শাবাশ! এত বিপদেও তুমি বুদ্ধি হারাওনি!

বিমল বললে, এখন মৃণুর ওপরেই সব নির্ভর করছে। সে যদি না আসতে পারে, তা হলেই আমরা গেলুম!

রামহরি বললে, তোমরা একটু চুপ করো খোকাবাবু, আমাকে বাবা মহাদেবের নাম জপ করতে দাও। বাবা মহাদেব তাহলে নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।

আচম্বিতে গর্তের ভিতরে একটা বিষম শব্দ হল-তারপরেই ভারী-ভারী পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ!

অন্ধকারে পিছনে হটতে-হটতে বিমল চুপিচুপি বললে, সরে এসো। দেয়ালের দিকে সরে এসো। গর্তের ভেতরে শত্রু এসেছে।

গর্তের অন্য দিক থেকে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল,-তার মধ্যে একজনের আর্তনাদ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্মভেদী। সে চিৎকার ক্রমে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে উপরে গিয়ে উঠল এবং তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল!

বিনয়বাবু ভগ্নস্বরে বললেন, আজ আবার নরবলি হবে। আমাদের আর একজনকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু আমরা কোনও বাধাই দিতে পারলুম না।

.

কাল সারা রাত গর্তের উপর থেকে রাক্ষুসে উৎসবের বিকট কোলাহল ভেসে এসেছে। এখনও সকাল হয়েছে কিনা বোঝবার উপায় নেই, কারণ এখানে আলোকের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

তবে দানব-পুরী এখন একেবারে স্তব্ধ। এতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকূপের বাইরে সূর্যদেব হয়তো এখন চোখ খুলে পৃথিবীর পানে দৃষ্টিপাত করেছেন।

বিমল, কুমার, বিনয়বাবু ও রামহরির সাগ্রহ দৃষ্টির সামনে গর্তের উপরে আবার কালকের মতো সেই মশালের আলো জ্বলে উঠল।

গর্তের উপরে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে মৃণু ডাকলে, কুমারবাবু!

কুমার ছুটে গিয়ে সাড়া দিলে, মৃণু, এই যে আমি!

চুপ! চ্যাঁচাবেন না! শত্রুরা সব ঘুমিয়েছে! এই আমি দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছি! দড়ি বয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে আসুন।

বিমল বললে, কুমার, তুমিই আগে যাও, তারপর যাব আমরা। গর্তের আর সব লোককেও বলে রেখেছি, তারাও পরে যাবে।

কুমার দড়ি বয়ে উপরে গিয়ে উঠল। সেখানে এক হাতে বাঘাকে আর এক হাতে মশাল ধরে মৃণু উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমার উপরে উঠতেই সে অগ্রসর হতে গেল।

কুমার বললে, একটু সবুর করো মৃণু, তোমার বাবাকে উপরে উঠতে দাও।

মৃণু বিস্মিত ভাবে বললে, আমার বাবা?

হ্যাঁ, কেবল তিনি নন, তোমার খোঁজে এসে আমার মতন বিমল আর রামহরিও বন্দি হয়েছে।

অ্যাঁ, বলেন কি।

ওই তোমার বাবা উপরে উঠলেন। দাও, বাঘাকে আমার হাতে দাও।

মৃণু ছুটে গিয়ে বিনয়বাবুর বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেখতে-দেখতে রামহরি ও বিমলও উপরে এসে হাজির হল।

কিন্তু তারপরেই গর্তের ভিতর থেকে মহা হই-চই উঠল। গর্তের ভিতরে আর যে সব মানুষ বন্দি হয়ে ছিল, মুক্তিলাভের সম্ভাবনায় তারা যেন পাগল হয়ে গেল! তারা সকলেই একসঙ্গে দড়ি বয়ে উপরে আসবার জন্যে চাচামেচি ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিলে।

পরমুহূর্তেই দুর থেকে অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল রেল-ইঞ্জিনের বাঁশির মতন তীক্ষ্ণ একটা শব্দ।

মৃণু সভয়ে বললে, সর্বনাশ, ওদের প্রহরীর ঘুম ভেঙে গেছে!

এখন উপায়?

আর কোনও উপায় নেই। ওই শুনুন, ওদের পায়ের শব্দ। ওরা এদিকেই ছুটে আসছে!

.

তেরো । রাত্রির কোলে সন্ধ্যানদী

আসন্ন মরণের সম্ভাবনায় যারা ছিল এতক্ষণ জড়ভরতের মতন, জীবনের নতুন আশা তাদের সমস্ত নিশ্চেষ্টতাকে একেবারে দূর করে দিলে।

লতা-দিয়ে তৈরি মাত্র একগাছা দড়ি,-কোনওরকমে একজন মানুষের ভার সইতে পারে, তাই ধরে একসঙ্গে উপরে উঠতে গেল অনেকগুলো লোক। তাদের সকলের টানাটানিতে সেই দড়িগাছা গেল হঠাৎ পটাস করে ছিঁড়ে। শূন্যে যারা ঝুলেছিল, নীচেকার লোকদের ঘাড়ের এবং গর্তের পাথুরে মেঝের উপরে তারা হুড়মুড় করে এসে পড়ল এবং আতঙ্ক ও যন্ত্রণা মাখা এক বিষম আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সে আর্তনাদ গর্তের উপরে এসেও পৌঁছোল, কিন্তু সেখানে তখন তা শোনবার অবসর ছিল না কারুরই! দলে দলে দানব ছুটে আসছে, তাদের পায়ের ভারে মাটি কাঁপছে, সকলের কান ছিল কেবল সেই দিকেই।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, মৃণু, মৃণু! কোনদিক দিয়ে গেলে আলোক-ঝরনা পেরিয়ে নদীর ধারে যাওয়া যায়?

মৃণু বললে, ওইদিকে!

বিমল বললে, সবাই তবে ওইদিকেই ছোট-আর কোনও-

কিন্তু বিমলের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি কোথা থেকে তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৃণুর মশালের আলোতে কুমার সভয়ে দেখলে, সেই ছায়ামূর্তির বিরাট দেহের তলায় পড়ে বিমল যেন একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল!

কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বন্দুকের শব্দ গিরি-গহ্বরের সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় বহুগুণ ভীষণ হয়ে বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তিটা সশব্দে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

তার পরেই বিমলের গলা শোনা গেল,-একেবারে বুকে গুলি লেগেছে, এ যাত্রা আর ওকে মানুষ চুরি করতে হবে না! ছোট ছোট, নদীর ধারে-নদীর ধারে!

সবাই তিরের মতো ছুটতে লাগল! ওই আলো-ঝরনা দেখা যাচ্ছে, চারিদিকের অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে আসছে এবং আলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসছে মুক্তির আভাস!

কিন্তু পিছন থেকে অমানুষিক কণ্ঠের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার এবং অসংখ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, কুমার! বিনয়বাবু! ওরা একেবারে কাছে এসে পড়লে আমরা আর কিছুই করতে পারব না। এইবারে আমাদের বন্দুক ছুঁড়তে হবে। এখানে আলো আছে, আমরা লক্ষ্য স্থির করতে পারব।

একসঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জন ও অগ্নি-উদগার করতে লাগল! বন্দুকের গুলি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন তিন-তিনটে রিভলভারের ধমক শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে রামহরি আবার বন্দুকগুলোতে নতুন কার্তুজ পুরে দেয় এবং বন্দুক আবার মৃত্যুবৃষ্টি করতে থাকে। এবং রামহরি দু-হাত শূন্যে তুলে নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে ওঠে-বোম বোম মহাদেব! বোম বোম মহাদেব!

আর বাঘা খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে তালে তালে বলে-ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চারটে দানবের লীলাখেলা একেবারে সাঙ্গ হয়ে গেল, আট-দশটা প্রপাত ধরণীতলে হয়ে ছটছট করতে লাগল। তাই দেখে আর সবাই ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে আবার অন্ধকারের ভিতরে পিছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

বিমল বললে, মৃণু! এইবারে ছুটে নদীর ধারে চল!

আবার সবাই ছুটতে আরম্ভ করলে। আলো-ঝরনা পার হয়ে আরও খানিকদূর এগিয়েই শোনা গেল, গম্ভীর এক জল-কল্লোল!

তারপর আলো-ঝরনা ছাড়িয়ে সকলে যতই অগ্রসর হয়, চারিদিকের অন্ধকার আবার ততই ঘন হয়ে ওঠে।

বিমল শুধোলে, মৃণু, আমরা কি আবার অন্ধকারের ভিতর গিয়ে পড়ব?

মৃণু বললে, না। এই দেখুন, আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি! এখানে বেশি আলোও নেই, বেশি অন্ধকার নেই,-এ যেন মায়া-রাজ্য! মায়া-রাজ্য না হোক, ছায়া-রাজ্য বটে! এখানে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না সমস্তই যেন রহস্যময়! এই আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে যে বিপুল জলস্রোত কোলাহল করতে করতে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, তার পরপার যেন রাত্রির নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। এ নদী দেখা যায়, কিন্তু স্পষ্ট করে দেখা যায় না। মনে হয়, ওর গর্ভে লুকিয়ে আছে কত অজানা আর অচেনা বিভীষিকা! ওর জলধারা যেন নেমে যাচ্ছে পাতালের বুকের তলায়!

বিমল বললে, আমি যদি কবি হতুম তাহলে এ নদীর নাম রাখতুম, সন্ধ্যানদী। কবিতার ভাষায় বলতুম, অন্ধ রাত্রির পদতল ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যানদীর অশ্রুধারা!

রামহরি বললে, খোকাবাবু, তুমি জানো না, এ হচ্ছে বৈতরণী নদী, এ নদী গিয়ে পৌঁছেছে যমালয়ে, এর মধ্যে নামলে কেউ বাঁচে না।

বিনয়বাবু বললেন, বিমল, এর ভেতরে নামা কি উচিত? পাহাড়ের গহ্বরে অনেক নদী আছে, পাহাড় থেকে বাইরে বেরিয়েছে যারা প্রপাত হয়ে। এ নদীও যদি সেইরকম হয়? তাহলে তো আমরা কেউ বাঁচতে পারব না!

বিমল জবাব দেওয়ার আগেই তাদের চারিদিক থেকে আচম্বিতে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হতে লাগল। বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল-লাফিয়ে পড়ো-জলে লাফিয়ে পড়ো, আর কিছু ভাববার সময় নেই-দানবরা আবার আক্রমণ করতে এসেছে।

সবাই একসঙ্গে নদীর ভিতর লাফিয়ে পড়ল। তখন জলের ভিতরেই পাথর পড়তে লাগল। সে সব পাথর এত বড় যে তার একখানা গায়ে লাগলে আর রক্ষা নেই! সকলে তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ডাঙা থেকে অনেক তফাতে গিয়ে পড়ল, শত্রুদের পাথর আর ততদূর গিয়ে পৌঁছোতে পারলে না!

বিমল বললে, এইবার সবাই খালি ভেসে থাকো, স্রোতের টান যেরকম বেশি দেখছি, আমাদের হাত-পা ব্যথা করবার দরকার নেই। স্রোতই আমাদের এই গহ্বরের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে!

কুমার বললে, বিমল, বিমল, তিরের দিকে তাকিয়ে দেখো!

দূরে-নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে দলে দলে দানবমূর্তি, তাদের বিপুল দেহগুলো যেন কালি দিয়ে আঁকা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে যেন কতকগুলো নিস্পন্দ পাথরের প্রকাণ্ড মূর্তি এনে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

নরদানবের সঙ্গে বিমলদের সেই হল শেষ দেখা। তারপর তারা নিরাপদে আবার সভ্যতার কোলে ফিরে এসেছিল, কিন্তু দার্জিলিংয়ে আর কখনও দানবের অত্যাচারের কাহিনি শোনেনি।